বিবর্তনের অন্তরালে বিবাহ-সমাচার

বিশ্বনাথ মজুমদার

গ্রন্থরশ্মি

২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশিকা :
মণিকুন্তলা মজুমদার
গ্রন্থরশ্মি
২০৬ বিধান সরণী,
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম মুদ্রণ : ১৯৬০

প্রচ্ছদ : বিমল পাল

টাইপ সেটিং :
টেকনো গ্রাফিক,
২১৩, বারুইপাড়া লেন,
কলকাতা-৩৫,

মুদ্রণে
তপনকুমার সিংহ
তপন প্রিন্টিং
৪০/১ এ, আর. এন. দাস রোড,
কলকাতা-৭০০ ০০১

উৎসর্গ

আমার পুত্রত্রয় শ্রীমান অপূর্ব, অনিরুদ্ধ, অশ্রুদ্যুতির হাতে তুলে দিলাম।

এ লেখা কষ্ট-কল্পিত লেখা নয়। সভ্যতার বিবর্তনের সাপেক্ষে সচরাচর যে সকল ঘটনা ঘটছে আজকাল আমাদের সমাজে, কিছুটা কল্পনার রং-তুলির সাহায্য নিয়ে আঁকা হয়েছে সেরূপ কতিপয় বিবাহ-বিষয়ক ঘটনার প্রতিরূপ।

কারো বিরুদ্ধে কিছু বলা বা রোষবশে কারো পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাতের, কোন অভিপ্রায় এখানে কাজ করেনি। সে রকম কিছু ঘটে থাকলে লেখক নিরুপায়।

—গ্রন্থকার

বিবর্তনের অন্তরালে বিবাহ-সমাচার

[পুরোনো আমলের ইঞ্জিনের সঙ্গে ছোটখাটো কারখানায় তৈরি বডি ফিট করা বেঢপ চেহারার একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো ফুটো তেরপলে ছাওয়া রাস্তার ধারের একটা নড়বড়ে চায়ের দোকানের সামনে। শহরতলীর এই রাস্তাটা বুক দিয়ে সেবা করে চলেছে মানুষের। ভরণ-পোষণের অভাবে তার ক্ষতবিক্ষত চেহারাটা শোষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে আর্তনাদ তুলেছে বারবার। গাড়িটার নাট-বল্টুগুলোকে আঘাতে আঘাতে ঢলঢলে করে দিয়েছে একেবারে। মালিক নিজেই ড্রাইভার। নামলেন তিনি। নামতে হলো তাঁকে। সমুখের রাস্তাটা নো এন্ট্রি ঘোষণা করছে আঙুল তুলে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে হাজির হলেন চায়ের দোকানটায়। দোকানের মালিক মাঝ-বয়েসী এক মহিলা। যৌবনটা তাঁর যাই যাই করেও যাচ্ছে না—পোশাক-আশাকেও তা যেন একটু ধরে রাখবার চেষ্টা চলছে। ড্রাইভার-কাম-গাড়ির মলিক ঐ ভদ্রলোক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে একবার তাকালেন তার দিকে। সদ্য কাটা পাঁঠার রক্তের মতো মুখভর্তি পানপিকটা বাইরের খোলা নর্দমায় সবেগে নিক্ষেপ করে সে এগিয়ে এল, সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল—বলুন! চা দোব?

সামনের বেঞ্চটায় দুজন বসে চায়ের গ্লাস হাতে। একজনের হাতে আবার শুধু লিকার। পাশে বসতে কেমন যেন একটু ইতস্তত বোধ করলেন তিনি। বললেন—না, চা খাব না। বলতে পারেন এখানে বিব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় থাকেন কোথায়?

মহিলা নিরুত্তর।

খদ্দের দুজনের মধ্যে একজন সবজানতার চালে তাকে উদ্দেশ করে বললেন—বিপিন বাঁড়ুজ্যেকে খুঁজছেন উনি, বুঝলে না?

মহিলা শুধু 'হুঁ' বলে একটা সায় দিল।

তারপর খদ্দেরটি বললেন—ঐ যে একবার বিপন্ন বাঁড়ুয্যে নাম নিয়েছিল না? ফের নাম পাল্টেছেন। লিখছেন বিব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নামে। মানসীর তো পারমানেন্ট খদ্দের।

মানসী ভারিক্কি চালে বলল—আমার পারমেন্ট খদ্দের কেউ নেই। তবে চিনি ভদ্রলোককে। ঐ কাগজে লেখেন তো?

গাড়ীর মালিক কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা খবরের কাগজ বের করে দেখে নিলেন নামটা। কনফার্মড হয়ে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ কাগজে বিব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নামেই উনি লেখেন।

মহিলাটি ভদ্রলোকের বাড়ির নিশানাটা বেশ নিখুঁতভাবে দিয়ে দিলেন।

গাড়ি যাবে না। ওখানেই থাকলো গাড়ি। পুকুরের পাড় ধরে একটা মোরাম রাস্তার ওপর জমা জল পেরিয়ে পেরিয়ে একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। একটা বাঘমুখ থেকে অনর্গল বেরিয়ে আসা পানীয় জলের অবিশ্রাম নির্গমন রাস্তার ওপর এনে দিয়েছে সরকারের সাধু প্রচেষ্টার মহাপ্লাবন।

ঐ কলটার সংলগ্ন একতলার ঘরটাই বিব্রত বাবুর। দরজাটা আড়-কপাটি করা আছে—জল ছিটকোচ্ছে বলে বোধ হয়। বিব্রত বাবুর খোঁজে আসা ঐ ভদ্রলোক দরজাটা খুলতে একটু বিচলিতই বোধ করছিলেন। শেষমেষ খুলেই ফেললেন। চট্‌পট্‌ ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

বিব্রতবাবু জনতায় চায়ের জল চাপিয়েছেন। আগন্তুককে একবার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিয়ে পাশের শতরঞ্জি পাতা তক্তাপোশটায় বসতে ইঙ্গিত করলেন। কী ব্যাপার, কে কোথা থেকে

আসছেন—এসব জানবার কোন তাগিদ নেই। বেশ দক্ষ হাতে একগ্লাস চা তৈরি করলেন। অর্ধেকটা আর একটা গ্লাসে ঢেলে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। মরচে পড়া কৌটো থেকে দুটো বিস্কুট বের করে একটা ভদ্রলোককে দিতে দিতেই বললেন—একটু চা খান।

উভয়েই তক্তাপোশে উপবিষ্ট। গরম চায়ে একটা চুমুক দিয়ে বিব্রতবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—মহাশয়ের নাম?

—শ্রীনির্বিকার চক্রবর্তী।

—ও! 'বিবর্তন' কাগজের সম্পাদক আপনি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আপনি—

—আপনার কাগজটা আমার খুব পরিচিত। সভ্যতার বিবর্তনের অন্তরালবর্তী কিছু কিছু ঘটনার পীড়াদায়ক দংশনে আমার মতো আরো অনেকে যে ভুগছেন তা আপনার কাগজেই দেখেছি। এ বিষয় নিয়ে লেখালেখিতে আপনাদের উৎসাহ দেখে খুব ভাল লেগেছে। আমি কিছু কিছু লিখি এ বিষয়ে।

— সেজন্যই তো আসা। যদি এক-আধটা লেখা আমাদের দেন।

—আমার লেখা পড়েছেন আপনি?

ব্যাগ থেকে একটা পত্রিকা বের করে দাগ দেওয়া একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন—এই যে! এই লেখাটা আপনার তো?—সয়ম্বরা?

— হ্যাঁ, এটা আমারই লেখা। ছাপা হবে ভাবিনি। প্রতিষ্ঠিত কাগজ। পাত্তা না পাওয়ারই কথা। দেখলাম একশ'টা টাকাও পাঠিয়েছেন। আরও লেখা পাঠাতে বলেছেন।

পাশের তক্তাপোশের ওপর একধারে একটা খবরের কাগজের পেপার ওয়েট হয়ে অলসভাবে পড়েছিল একটা প্রুফের ব্যান্ডিল। নজর পড়তেই ওটা টেনে নিয়ে গার্ডারটা খুলে ফেললেন নির্বিকারবাবু। একি! এ যে ইংরেজী-বাংলাতে মেশামেশি

পাদর্থবিদ্যার বইয়ের প্রুফ। বললেন—কী ব্যাপার? এসবও করেন নাকি?

—ও! ওটা পেশা। বাজারের প্রুফ দেখে পেট চালাই। আর নেশা হচ্ছে ঐ যে বিবর্তনের অন্তরালবর্তী ঘটনা! তারই একটা ছবি আঁকার দুর্বল প্রয়াস। কলমের আঁচড়ে কয়েকটা আঁকিবুকি আর কি।

—বেশ বেশ! ঠিক আছে। বাজারের প্রুফ দেখার কাজটা বাদ দিয়ে বেশ গুছিয়ে বাগিয়ে কলমটা ধরুন তো! পেট চালাবার ব্যাপারটা আমাকে একটু দেখতে দিন।

বিব্রতবাবুর সারামুখে এক ঝলক ঠাট্টার হাসি ছড়িয়ে পড়ল। বললেন—পেট বড় বালাই রে ভাই! শখ মেটানো চলে, আক্ষেপ মেটানো চলে ঝেড়ে কাপড় পরানও যায় কাকেও কখনো বা। অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শাশ্বত মূল্যবোধের সপক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে মন ভরবে হয়তো কিন্তু পেট ভরবে না রে ভাই।

গলায় একটু জোর এনেই বললেন নির্বিকারবাবু—রাখুন তো মশায় ও-সব হতাশার কথা। আমার কাগজে নিয়মিত লেখা দিন। আপনার চলার মতো অর্থের যোগান আমিই দোব। অভাব রাখবো না।

বিব্রতবাবু যেন সত্যিই বিব্রত বোধ করলেন কিছুটা। বললেন—ঠিক আছে, ঠিক আছে, আগে দেখুন আমার লেখা খাচ্ছে কেমন লোকে। তারপর ভাববেন পয়সা-কড়ির কথা। আজ লেখা একটা নিয়ে যান।

বালিশের তলা থেকে কাটা প্রুফের সাদাপিঠে লেখা কয়েক পৃষ্ঠা নির্বিকারবাবুর হাতে দিলেন। নির্বিকারবাবুও একশ টাকার একখানা নোট তাঁর দিকে এগিয়ে ধরে বললেন—এটা রাখুন অগ্রিম দক্ষিণা।

বিব্রতবাবু গ্রহণ করলেন না সেটা। বললেন—অগ্রিম টগ্রিম লাগবে না। ছাপা তো হোক্ আগে লেখাটা, তারপর যা দেখার

দেবেন।

কয়েকটা দিন কেটে গেছে। বিব্রতবাবু চা খেতে আসেননি মানসীর দোকানে। আজ এসে জানতে চাইলেন কেউ কোন কাগজপত্র দিয়ে গেছে কি না। অনাদিবাবু আর নিবারণবাবু যথারীতি বেঞ্চে বসে চা খেতে খেতে একটা কাগজ পড়ছিলেন—'বিবর্তন'। মানসী সেটা ওঁদের হাত থেকে টেনে নিয়ে ভাঁজ করে বিব্রতবাবুর হাতে দিল। আজও তিনি চা খেলেন না। মানসীও সাধলো না। মেজাজটা তার ভাল নেই। খদ্দেরপত্র নেই। চলবে কি করে? একটু আগেই অনাদিবাবু আর নিবারণবাবুকে শুনিয়েছে বেশ দু'কথা। বলেছে ঐ বুড়ো দুটো সারাক্ষণ ওখানে বসে থাকায় ছেলে-ছোকরারা দোকানে আসতে চায় না। একে তো উল্টোদিকের দোকানটায় কাঁচা বয়সের মেয়েরা চা-চপ-কাটলেট সার্ভ করছে, তাই শুধু কাঁচা বয়সের ছেলে কেন, চুলে পাক ধরেছে এমন লোকেরও ভিড় হচ্ছে ওখানে। অনাদি-নিবারণবাবুও মস্করা করে তাকে বলেছে বিব্রতবাবুকে অনুরোধ করতে—ঐ বিষয়টাও যেন বিবর্তনের লেখার বিষয় করে নেন তিনি।

অনেকেই, বিশেষ করে এই দুই ভদ্রলোক, বিপিনবাবুকে ঘিরে তার ওপর বেশ কিছু মিঠে-কড়া বিদ্রূপ বর্ষণ করে থাকেন। মানসী কখনও প্রতিবাদ করে, কখনও গায়ে মেখে নেয়। আজও সে কিছু বললো না। দু'বন্ধুতে মুখ গোমড়া করে বেরিয়ে গেল। মোড় থেকে 'বিবর্তন' কাগজ একখানা কিনে নিয়ে ফের ঘুরে এল মানসীর দোকানে। দু'জনে দু'কাপ চা নিয়ে মেজাজে পড়তে বসল বিব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটা। নিবারণবাবু পড়ছেন আর অনাদিবাবু শুনছেন, শুনছে মানসীও। বিব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :]

প্রতিবেদন এক

বিযাক্ত বিবাহ

নারী প্রগতির যুগ। সমর্থনের বিরুদ্ধে যায় সাধ্য কার? সমাজে কিন্তু ছোট-বড় এমন অনেক ঘটনা ঘটছে যা অন্য কথা বলছে। তরুণ-তরুণীদের হুশিয়ারি দিচ্ছে—সমাজ সংস্কারের নামে স্বেচ্ছাচারিতায় গা ভাসিয়ে দিলে অপরিণামদর্শিতার আগুনে জীবনটা ঝলসে যাবে। দগ্‌দগে পোড়া ঘায়ের বীভৎসতা কোন প্রগতির নামাবলী ঢেকে রাখতে পারবে না। তারুণ্যের অপমৃত্যু অনিবার্য।

সম্প্রতি সংঘটিত গোসাঁইবেড় গ্রামের একটা প্রচলিত বিধি-ব্যতিরেকী অসবর্ণ বিবাহের পরিণতি তারই একটা নাজির।

সম্ভ্রান্ত অধিকারী বংশের কন্যা চৈতালী পীযূষ দাস নামক এক চর্মকার পাত্রকে পতিত্বে বরণ করেছিল। বেশ কয়েকমাস আগে। লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সে বিবাহ-বন্ধন অনুমোদিত হয়েছিল কিনা তা কেউ জানে না। রেজিস্ট্রি হলেও হয়ে থাকতে পারে। তবে একান্ত গোপনে। উভয় তরফেই খোঁজ-খাঁজ চলতে থাকে বেপাত্তা দম্পতির সন্ধানে। অতঃপর সুদূর শ্রীক্ষেত্রের নিকট মুচিশাহী বাজারে পীযূষের কোন এক আত্মীয়ের বাড়িতে তাদের হদিস পাওয়া গিয়েছিল বলে লোকে বলে। স্বামী-স্ত্রী পরিচয়েই উঠেছিল তারা সেখানে। চৈতালীর সিঁথির সিঁদুরের রক্তিম রেখা তার এয়তির পরিচয়টাকে এতটুকু ম্লান হতে দেয়নি।

অনেকদিন হয়ে গেছে। এ নিয়ে আর কারো মাথাব্যথা ছিল না। লোকে জেনেছে পীযূষের মা-বাবা ব্যাপারটা জানতো। চৈতালীর বাড়িরও জ্ঞাতিবর্গের অনেকেরই গোচরে নাকি ছিল ঐ চর্মকার পাত্রের সঙ্গে বৈষ্ণব তনয়ার প্রণয়ের ব্যাপারটা। জনশ্রুতি এমনও যে, মেয়ের মায়ের আস্কারা ছিল। বাবা নেই। বর্তমান ব্যবস্থায় মেয়ের বিয়ে দেওয়া

সহায়সম্বলহীনা বিধবা মায়ের সাধ্য কি? পাঁচজনের সাহায্যে গ্রামের স্কুল থেকে এইচ. এস. পাশ করিয়েছে মেয়েকে। কিন্তু তাতে কি? বিয়ের ক্ষেত্রে তার আর মূল্য হচ্ছে কোথায়? কাজেই মেয়ে যা করছে ঠিক করছে বলে তাকে সায় দিয়ে থাকাও অসম্ভব নয় মায়ের পক্ষে।

এতদিন পরে আবার ও প্রসঙ্গ কেন?

সাদা পোশাকে পুলিশ নাকি এসেছিল পীযূষ-চৈতালী প্রেমকথার তথ্যানুসন্ধানে। অঞ্চল প্রধানের ওপরও ভার পড়েছে এ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ সংবাদ সরবরাহ করার।

বিষয়টায় বাতাস লেগেছে। মেয়ের কেচ্ছা-গুঞ্জন চৈতালীর মায়ের কানের পর্দা গরম করে দিয়েছে। বুক ধড়ফড়ানি বেড়েছে। ক'দিন হলো চান-খাওয়া তো বন্ধই। পীযূষের গুণিন কাকা দেখে গেছে। গুণিনি ঝাড়ফুঁকই নয়—কবরেজি বড়ি-বাটকেলও কিছু দিয়ে গেছে। কিন্তু কাজ কিছুই হলো না। মধ্যরাতে হাঁফের টানটা বেড়ে উঠলো খুব। অধিকারী বংশে লোকজন কম নয়। অনেকেই এসে গেল। না ডাকতেই অবশ্য এসেছে সবাই। সারা রাতটাই জেগে কাটালো অনেকেই, বুড়ীর কাছের লোক বলতে এক ভাশুরপো। সেও এলো। সময় নেই বুঝে গীতাপাঠ করল কিছুক্ষণ। শেষ জলটুকু ভাশুরপোর হাতেই খেল বুড়ী। দেহ রাখল।

বেঁচে থাকতে বড় কেউ একটা আসতো না বুড়ীর খোঁজ নিতে। এ অবস্থায় পাড়া-গ্রামের লোক আর থেমে থাকে কী করে? ভোর না হতেই বহু লোকজন জড়ো হল বুড়ীর উঠোনে।

দাহ তো করতে হবে। তোড়জোড় চলছে। একটা চারা আমগাছ ছিল ঘরের উঠোনে। বুড়ীর নিজের হাতে লাগানো। ওটাই কাটার ব্যবস্থা হলো।

প্রবীণ একজন মহিলা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে চললেন—কোলের হোক কাঁখের হোক নিজের বলতে আর আছে কে? ঐ তো একটা মেয়ে, তাও তো আধাভদ্রে গেল। মরণকালে একটু জলও পেল না মেয়ের।

ভাশুরপোর তো আগুনের অধিকার। ছেলের কাজ তো ওকেই করতে হবে। তারপর কত্তার আমলের শিষ্যবর্গও তো আছে কিছু। এদানী আসে না বড় একটা কেউ। তবু এ সময় কিছু কিছু দেবে সবাই। কোনমতে জ্ঞাতিদের নখচুল ফেলার ব্যবস্থা করে শুদ্ধ হয়ে নেওয়া—আর পাঁচটি বেরাম্মন। ব্যস্।

নিমেষে সব ব্যবস্থা যেন হয়ে গেল।

ওদিকে অঞ্চল প্রধান আর দু'জন সেপাই সহ থানার ছোটবাবু পৈঠে বেয়ে উঠে আসছিলেন বুড়ীর ঘরপানে। অমনি ঝুটঝামেলা এড়াতে কেউ কেউ কেটে পড়ার তাল করতে থাকলো।

ভীড় হাল্কা হয়ে যাচ্ছে দেখে নাম ধরে ধরে প্রধানমশায় ডাকলেন কয়েকজনকে। তিন/চারজন এগিয়ে এলো। না এসে উপায় কি?

দারোগা তাঁর স্বভাব-তাচ্ছিল্যে কাকেও উদ্দেশ না করেই বললেন—মোলো কখন বুড়ী?

—তা রাত পেরায় তিনটে টিনটে হবে। বুড়ীর ভাশুরপোই উত্তর দিল।

—ওর নিজের কে আছে?

—এখানে কেউ নেই স্যার!

—ওর যে মেয়েটা ছিল, সেটা কোথায়?

কারো মুখে আর কোন কথা নেই।

শ্লেষের ভঙ্গিতে দারোগাবাবু বললেন—বুড়ী কি মেয়েকে বেচে খেয়েছিল না কি?

কেউ কিছু বলছে না দেখে দারোগাবাবু তাঁর সেপাইদের অর্ডার দিলেন—কাম শুরু করো!

অঞ্চল প্রধানমশায় বয়স্ক কয়েকজনকে থাকতে বললেন। বললেন—ঘরটা সার্চ করা হবে।

তন্ন তন্ন করে সার্চ করা হলো। তাক-তুক বাক্স-প্যাঁটরা যা ছিল, সব

আনকুট-ভানকুটে ভর্তি। পাওয়ার মধ্যে পাওয়া গেল একটা কাঠের বাক্সে নগদ একশ কুড়ি টাকা আর মৃতার বালিশের তলায় একটা চিঠি। সম্প্রতি এসেছে বলে মনে হলো।

দারোগাবাবু সোৎসাহে চিঠিখানা হস্তগত করলেন। মন দিয়ে পড়লেন। কাকেও কিছু না বলে ভাঁজ করে সেটা খাঁকি জামার বুক পকেটে ভরে বোতামটা ভাল করে এঁটে নিলেন। টাকা কটা বুড়ীর ভাশুরপোর হাতে দিয়ে বললেন—মড়াটার গতি করে দাও।

ঘরটার ভেতরে চোখ চারাতে দারোগাবাবুর চোখে পড়ল দেওয়ালে টাঙানো একটা ফটো। দুবছর আগের তোলা চৈতালীর একটা ছবি—স্কুলে স্টেজে কবিতা আবৃত্তি করছে। বেশ ভালো আবৃত্তি করতো মেয়েটা—জানতে পারলেন দারোগাবাবু লোকমুখে। নিজহাতে তুলে নিলেন ছবিটা। গলা পর্যন্ত কাপড়ে ঢাকা শবটার দিকে একবার তাকাতে হলো তাঁকে। সে যেন বলছে 'ওটা নিও না।' কিন্তু নিতে হলো এবং তা যত্ন করে কাগজে প্যাক করেই নিতে হলো।

প্রধানমশায়ের অনুরোধক্রমে দারোগাবাবুকে আসতে হলো তাঁর বাড়িতে একটু চা খেতে।

চায়ের টেবিলে বসে প্রধান মশায়ের কৌতূহলী কিছু জিজ্ঞাসার উত্তরে পীযূষ-চৈতালী সম্পর্কিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতায় রত হলেন তিনি। বললেন—আই. বি. ডিপার্টমেন্টই যা করার করছে। যদি কোন ইনফরমেশন মেলে এই ভেবে একটু ঘুরে গেলাম। জানা তো গেল কিছু। এই মেয়েই সেই মেয়ে কিনা সেটা ভেরিফাই করে নেওয়া যাবে।

—কোন্ মেয়ের কথা বলছেন স্যার? হতবাক্ জিজ্ঞাসা প্রধানের।

—চৈতালী বলে একটা বিয়েউলী মেয়ে খড়্গপুরে তালবাগিচা বলে একটা জায়গায় এক রিটায়ার্ড স্টেশন মাস্টারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। লুকিয়ে বিয়ে। ছেলেটা পুরীতে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে তুলেছিল নিয়ে গিয়ে।

—সেখান থেকে তারা খড়্গাপুরে কেন?

—আরে তারা নয়, মেয়েটি একাই এসেছে। ছেলেটার তো খোঁজ-খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

—তার মানে?

—মানে আর কি? দিন কতক বৌ নিয়ে আনন্দ করে ভেগে পড়েছে। মাসতুতো ভাইয়ের বাড়িতে রেখে গিয়েছিল।

—তারপর স্যার?

—না, আর কিছু না বলাই ভাল। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন দারোগাবাবু।

—বলুন না স্যার। কিছু ইনফরমেশন আমার কাছ থেকেও তো পেতে পারেন?

দারোগাবাবু পুনরায় আসন গ্রহণ করলেন। বলতে লাগলেন—মাসতুতো ভাইটা একে জাতে মুচি তায় মাতাল। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ধেনো মদের আড্ডা বাড়িতেই। ওর বৌটা নাকি নবাগতার উপর সদয় হয়েছিল। তাও কি আর বিনা কারণে?

—কারণ?

—স্বোয়ামী দেবতার ঐ উঠতি-বয়সের মেয়েটির উপর নজরটা ভাল ঠেকছিল না তার, এই আর কি।

দারোগাবাবু বিবরণটা সংক্ষিপ্ত করতে চাইছেন মাঝে মাঝে। কিন্তু পারছেন না। বলেই চলেছেন—খড়্গাপুরে মেয়েটির আপনজন একজন আছেন জানতে পেরে পীযূষের ঐ মাসতুতো ভাইয়ের বৌ গাঁটের টাকা দিয়ে টিকিট কেটে তাকে ট্রেনে তুলে দিয়েছিল।

সবই বোঝা গেছে এমন একটা ভাব দেখিয়ে বললেন প্রধান-মশাই—আচ্ছা সেই আপনজনটির নাম কি মহাদেব সরখেল? রেলের এ. এস. এম. ছিলেন? রিটায়ার্ড করেছেন এখন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন। পকেট থেকে একটা নোট বুক বের করে

দেখে সিওর হয়ে নিয়ে বললেন—উনিই রেখেছেন মেয়েটিকে। থানা পুলিশ উনিই করছেন।

—চৈতালী তো ওঁর গুরুকন্যা। অনেকবার এসেছেন এখানে। সজ্জন ব্যক্তি। একটু গম্ভীর হয়ে বললেন প্রধান মশায়।

—কিন্তু ছেলেটার কোন হদিস দিতে পারছেন না আপনারা? পাশের গাঁয়েরই তো ছেলে। আসে টাসেনি? কথা বের করে নেওয়ার কায়দাতেই বললেন দারোগাবাবু।

—না না, তার তো কোন খোঁজ-খবর নেই। ওর বাপটাও তো দুঃখ করছিল—লেখাপড়া কি আমাদের হয়? তা তো হলই না। উল্টে ভদ্দরলোকের বাড়ির একটা মেয়েকে নিয়ে দেশছাড়া হয়ে গেলি!

—ছেলেটার কতদূর লেখাপড়া? চাকরি বাকরি কিছু পেয়েছিল কি জানেন?

—না না, ওর বাপের কাছেই তো শোনা, তপশীল তো? রেলে চাকরি হয়ে যাচ্ছে, আর অসুবিধে নেই, এই বলেই তো বেপাত্তা। লেখাপড়া তো ক্লাশ নাইন। আর তো পড়তে পারেনি।

—মেয়েটা তো এইচ. এস.? তাহলে পটলো কি করে? দারোগার ভাষা।

—ছেলেটা সুশ্রী। রং ফর্সা না হোক, চেহারার জৌলুস আছে।

—ছেলেরাই তো মেয়েদের রূপে ভোলে জানি। এক্ষেত্রে তাহলে উল্টো?

দারোগার মুখে আটকাচ্ছে না কিছুই।

প্রধানমশায় ভেতর মহলে উঁকি দিয়ে দেখলেন কেউ আছে কিনা। স্ত্রীকে চোখে পড়ল। প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চেষ্টা করলেন। বললেন—বাদ দিন ও সব কথা। যে যা করছে করুক। আপনাদের কাজ আপনারা করুন।

দারোগাবাবু একটু টেরচাভাবে বললেন—আমাদের কাজই তো

করছি মশাই। ঐ যে ইনফরমেশন! আচ্ছা প্রধানমশাই, একটা কথা মানেন তো, মেয়েরা খুব প্র্যাকটিক্যাল? তারা শুধু পুরুষ মানুষেরই প্রেমে পড়ে না, তাদের টাকা-পয়সার প্রতি প্রেমটাও তো জড়িয়ে থাকে তার সঙ্গে। দেখবেন, ওরা বেকার ছেলেদের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলেই চলে। বিয়েটি করছে না। তারপর যেই বেকারের তালিকা থেকে নাগরের নামটি কাটা গেল, অমনি শুভস্য, শীঘ্রম্। মেয়ের অভিভাবকরাও যুগের দোহাই পেড়ে হাই ভেঙ্গে বাঁচেন। এক্ষেত্রে মেয়েটা এতো বোকামি করল কি করে?

—ঐ যে! সিডিউল্ড কাস্ট! আজকাল ওদেরই তো চাকরি। আটুট বিশ্বাস। পরে হয়তো ঠকেছে, চাকরি কোথাও করছেও বা। এসব ছেলের গুণে ঘাট নেই। অন্য কোন মেয়ের বাবাকে আবার দায়মুক্ত করে বসে আছে হয়তো।

—সেটাই তো দেখতে হচ্ছে এবার। ছেলেটার নাম পীযূষ দাস। তাই তো? চলি এখন। নমস্কার! প্রধানবাবুকে মুক্তি দিয়ে চলে গেলেন দারোগাবাবু।

না। পীযূষ চাকরি জোগাড় করতে পারেনি কোথাও। যারা ভরসা দিয়েছিল, তাকে দেখলেই বিরক্তিতে মুখটা তাদের ফ্যাকাশে হয়ে যায় এখন। বানিয়ে বুনিয়ে কিছু একটা বলে। আজকাল আর মিথ্যে আশ্বাসও কেউ দেয় না। উপদেশ টুপদেশ দেয় কেউ কেউ কখনও কখনও। সে ছিল তপশীল। সেটাই তো চাকরি পাওয়ার পক্ষে বড় কোয়ালিফিকেশন আজকের দিনে। তাদের প্রতি সরকারের উদারতার কথা সে শুনেছে কত, বিশ্বাস তো মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিভাবে-চাকরিটা তার হস্তগত হবে তার সঠিক রাস্তা তার জানা ছিল না ঠিকই, কিন্তু স্বজাতি বন্ধু-বান্ধব, চাকুরে আত্মীয়-স্বজন সবার কাছেই তো ধরনা দিয়েছে দিনের পর দিন। কোথাও পেয়েছে কটাক্ষ, কোথাও শুকনো সহানুভূতি। পুরুলিয়ার পারবেলিয়া কয়লাখনির কুলিগিরি তার জীবনের বিধিলিপি

হয়ে এগিয়ে এলো। তাই চলতে থাকলো কিছুদিন। তাও সর্দারকে খুশি রাখতে বেগার দিয়ে দিয়ে। টাকা কিছু কিছু পাঠিয়েছে সে মাসতুতো ভাইকে। সে পেয়েছে কি না তাও সে জানতে পারেনি। অপরের মাধ্যমে দূরের ডাকখানা থেকে পাঠানো হয়েছে অন্য লোকের কেয়ার অফে। নিজের স্থায়ী ঠিকানা তো ছিল না। আজ এখানে, কাল সেখানে। তাছাড়া চৈতালীর কাছ থেকেও নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে সে। লজ্জা লুকোতে গ্রামদেশের কেউ তার হদিস না পায় সেদিকেও লক্ষ্য ছিল তার।

না খেয়ে খেয়ে শরীরটা ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। সে চেহারাও নেই, সে শক্তিও নেই। তার ওপর টবে কয়লা ভর্তির কাজ। হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি। বুকে পিঠে প্রচণ্ড ব্যথা। কাজ কামাই করে ফেললো সে ক'দিন। এ কাজ কি কারো জন্যে বসে থাকে? অন্য লোক করছে সে কাজ। হায় অদৃষ্ট। এই নিদারুণ পরিশ্রমের কাজ, তাও অভাগার ভাগ্যে সইলো না। ধূলি-ধূসরিত জরাজীর্ণ অতিরিক্ত প্যান্ট-সার্ট সাইড ব্যাগে ভরে নিয়ে একটা হাড়-পাঁজরা মচড়ানো দীর্ঘশ্বাস নিষ্কাশন করে পা বাড়ালো ফেরার পথে। মালগাড়ির ইঞ্জিনে চেপে এসে গেল আদ্রা পর্যন্ত। আসানসোল-পুরী ট্রেনটায় উঠে বসলো।

গাড়ি ছুটলো। ঘুম নেমে এলো পীযূষের ক্লান্ত চোখে। চৈতালীর হাস্যে চ্ছল মুখখানা বুকে টেনে নিয়ে তার মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়া রেশমী চুলের দুষ্টু বাধা আলতো করে সরিয়ে দিতে হাতটা এগুতে যাবে এমন সময় কে তার হাতটা চেপে ধরে নাড়া দিল। তন্দ্রা গেল টুটে—স্বপ্নও। হ্যাঁ টি. টি. ই.-ই তো। টিকিট চাইছে। টিকিট তো নেই। উইদাউট টিকিটের যাত্রী। পরের স্টেশনে নেমে যেতে হলো।

স্টেশন খড়্গাপুর। প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুড়ঙ্গ পথটার মুখেই বাঁ-হাতি কোনাটায় থেবড়ে বসে পড়ল পীযূষ। শরীর আর বইছে না। পাঁউরুটি আর কলা কিনেছিল বাঁকুড়ায়। সাইড ব্যাগ থেকে বের

করল। গোগ্রাসে গিললো সেগুলো। খবু খিদে পেয়েছিল। পাশের পানীয় জল লেখা সাইনবোর্ডটার নিচের কলটা থেকে এক পেট জলও খেয়ে এল। ব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ। দু'এক লাইন লিখলও সেটাতে। খামে ভরে রেখে দিল সেটা ব্যাগে।

কত ট্রেন এল গেল। কত লোকের ছোটাছুটি। পথ-চলতি কথাবার্তা সবই রাত্রির নিস্তব্ধতায় ঝিমিয়ে গেল। মাঝে মধ্যে ডিজেল ইঞ্জিনের জোড়া শাঁখের আর্তনাদ আর স্টীম ইঞ্জিনের দমবন্ধ করা উর্ধ্বশ্বাসের কর্কশ আওয়াজ রাত্রিটাকে বীভৎস করে তুলেছে যেন কত।

সারা অঙ্গে অবসাদ। সমুখের পথ আঁধারে গিয়েছে ঢেকে। তৃষাতুর লক্ষ্যটাকে দূরে, বহু দূরে পুরীর পানে দেয় পাঠিয়ে। ধোঁয়াশায় ভরা সে পথ। তবে পথপ্রান্তে ভেসে ওঠে অপেক্ষারতা চৈতালীর বিড়ম্বনা-লাঞ্ছিত দড়ি পাকানো ঋজু দেহটা। পীযূষ দেখতে পায় হতাশা তার মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। আশায় বুক বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে তার প্রশস্ত বক্ষে। খুঁজে পেয়েছে যেন তার হারিয়ে যাওয়া নিরাপদ আশ্রয়।

ঘুম নেমে এসেছে কখন। বেশিক্ষণ নয় বুঝি। সেপাইয়ের রুলের গুঁতোয় ঘুম ছুটে গেল। জেরায় জেরায় তচ্‌নচ্‌ করে দিল তাকে। সত্যি বলতে পারছে না পীযূষ একটাও। নাম বলছে না কিছুতেই। সেপাই দুজন আর বাড়াবাড়ির মধ্যে গেল না। থানায় নিয়ে গেল তাকে একরকম ধরে বেঁধে।

থানার বড়বাবু যথারীতি দু'চার ঘা ধরিয়ে নামটা বার করার চেষ্টা করল। উত্তর একটা আদায় হলো—পীযূষ।

কী যেন বুঝে ফেললেন বড়বাবু। লক আপে পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু সহসা পীযূষের মুখ দিয়ে নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল স্রোতের বেগে। কালবিলম্ব না করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হলো তাকে।

দারোগাবাবু মহাদেব সরখেলের বাড়িতেও সেপাই পাঠিয়ে খবর

দিলেন একটা।

শেষ রাত। কড়া-নাঁড়ার শব্দ, মহাদেববাবুর মোটা গলার ভারি শব্দে চৈতালীরও ঘুম ভেঙে যায়। বেরিয়ে আসতে মহাদেববাবু বললেন—পীযূষ নামে একজন কাকে পেয়েছে পুলিশ। হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে তাকে। সকাল হোক। তারপর গিয়ে দেখে আসবো কে সে।

চৈতালী স্তম্ভিত।

সস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে মহাদেববাবু ভেতরে নিয়ে গেলেন তাকে।

পুলিশের গাড়িটা একটা শব্দের ঝাঁকানি দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চৈতালীর বুকেও মস্ত একটা পাথরের চাঙড় আছড়ে পড়ল।

সকাল সাতটা। হাসপাতাল।

মহাদেববাবু চৈতালীকে সঙ্গে নিয়ে এনেকোয়ারি থেকে পুলিশ নির্দেশিত ব্যক্তিটির হদিস নিয়ে ইমার্জেন্সী ওয়ার্ডের দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন।

হ্যাঁ পীযূষ। এই তো চৈতালীর পীযূষ। নিথর হয়ে পড়ে আছে। সাড় নেই বুঝি। সিস্টার এসে একটু নাড়া দিয়ে ডাকলেন রোগীকে—দেখুন, আপনার কে এসেছে!

চোখ খুলে তাকালো সে চৈতালীর দিকে। পলক ফেলতে ইচ্ছে নেই যেন। পাশে পড়ে থাকা সাইড ব্যাগটার মধ্যে হাত চালিয়ে খামে ভরা চার ভাঁজ করা একটা কাগজ এগিয়ে ধরল চৈতালীর দিকে। তাতে লেখা ঃ . চৈতালী! পরাজিত আমি। কেউ বাঁচতে দিলে না আমায়—পীযূষ।

কিছু বলবে বলে মুখটা একবার খুলেছিল সে। বলা হলো না কিছুই। কাশতে কাশতে দম আটকে যাওয়ার উপক্রম। সঙ্গে সঙ্গে ঝলক ঝলক রক্ত। চৈতালী আঁচল দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিল তার।

ডাক্তার এলেন। সঙ্গে নার্স। ইনজেকসন একটা রেডি করেই এনেছেন। ইনজেকসন দেওয়া হলো। পীযূষের পলকহীন দৃষ্টি নিবদ্ধ রইলো চৈতালীর মুখের ওপর। আস্তে আস্তে পাথর হয়ে গেল চোখ দুটো তার। ডাক্তার পাল্‌স্‌ দেখে হাত ছেড়ে দিলেন—এক্সপায়ার্ড।

চৈতালী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো না। পীযূষের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিলাপ করলো না। গণ্ড বেয়ে দু ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়লো শুধু প্রিয়ের অতৃপ্ত আত্মাকে ঘিরে।

পুলিস এসেছে। চৈতালীর ফটো, মাকে লেখা তার চিঠি ঘটনা কিনারায় সুরাহা করে দিয়েছে।

চৈতালীর সিঁথির সিঁদুর বিদায়কালে সাক্ষ্য রাখলো চৈতালী-পীযূষের বিবাহের। চৈতালী এখন কি করবে?

[বিব্রত বাঁড়ুজ্যের নাম বেশ কিছু লোকের মুখে। শনিবারের প্রতীক্ষায় অনেকেই।

শনিবার এসে গেল। 'বিবর্তন' লাইন দিয়ে বিক্রি হলো। নিবারণবাবু অবশ্যই সংগ্রহ করেছেন একটা। আজ আর মানসীর দোকানে নয়। পাশের পানের দোকানের পরিত্যক্ত একটা ভাঙা ডেস্কোয় বসে নিবারণবাবু কাগজটা পড়ছেন। চা একটা ভর্তি গ্লাস মানসীই পাঠিয়ে দিয়েছে। অনাদিবাবু অনুপস্থিত আজ। এ সংখ্যায় বিব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বেশ কয়েকটা কলম।]

প্রতিবেদন দুই

বিবাহ সংঘাত

শিলিগুড়ির সিবক রোডের সেই আভিজাত্যের চুনকালি খসে পড়া সিংহমার্কা প্রাচীন বাড়িটা খুঁজে বের করতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি কুহেলিকার। সঙ্গে মলি সেন। বাপ-মায়ের দেওয়া মল্লিকা নামের টুকরো এই 'মলি'। সাহেব-মেম-ঘেঁষা স্বামীর পাইপের ধোঁয়ায় কুণ্ডলিত হয়ে বেরিয়ে আসা ওই আদরের নামটা তিনি এখনও ধরে রেখেছেন বিবাহিতা মহিলার মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে। বর্তমানে তিনি স্বামী-পরিত্যক্তা। ভাবানীপুরে একটা নার্সিং-হোমে কাজ করেন। সম্পর্কে নাকি কুহেলিকার মাসী। এক বিয়ের নেমন্তন্ন বাড়িতে পুরনো সম্পর্কের জের ধরে আলাপ। এখন বেশ একটু ঘনিষ্ঠ।

সন্ধ্যা হয় হয়। কুহেলিকা মলি সেনের হাত ধরে দোতলায় উঠতে উঠতে বললে—মাসী, রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' পড়েছ?

—পড়েছি। তুই থাম। ভয় করছে আমার। কোন সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না যে। ...ঐ যে কোণের ঘরটায় আলো জ্বলছে। চল্ আস্তে আস্তে। মলি মাসী চাপা গলায় বলেন।

পায়ে শাড়ী জড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন তিনি। কুহেলিকা ধরে সামলে

দিল। নিজের তার চুড়িদার। জড়িয়ে পড়ার ভয় নেই।

শক্ত দরজা। নীল-লাল-বেগুনী রঙের ঈষদচ্ছ কাচের ভেতর থেকে রং-বেরঙের আলোর একটা গোছা বাইরের বারান্দায় ছড়িয়ে পড়েছে। সাহসে ভর করে এগিয়ে গেল দুজনে ঐ শেষের ঘরটায়—খুট্ খুট্ করে দরজায় টোকা মারা শব্দও পাঠাতে থাকলো ভেতরে।

ভেতর থেকে ছিটকিনি খোলার জোরালো শব্দটা মহিলা দুটিকে বেশ একটু দূরে ছিট্‌কে দিল যেন। দেওয়াল-সই দরজার পাল্লাদুটো কিন্তু দুদিকে সরে গিয়ে সসম্ভ্রমে স্বাগত জানালো তাদের।

মাদ্রাজী কায়দায় দোপাট্টা ধুতি-পরা হিমানীশ চওড়া বুকে দোলানো মোটা পৈতেগাছাটা দু'হাতে মাঞ্জা দিতে দিতে বেরিয়ে এলো বাইরে। কণ্ঠ থেকে নির্গত হলো তার একটা মাত্র অব্যয় পদবাহী শব্দ 'আরে!'—কে যেন সারা বারান্দাটায় ঢেলে দিল দলা দলা বিস্ময়।

অদূরে ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে থাকা মলি মাসীকে ইশারায় ডেকে নিয়ে ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে এক ফালি বিষণ্ণ হাসি শুধু ঠোঁটে নয়, চোখ দুটোতেও কাজলের মতো করে টেনে দিল কুহেলিকা। মঞ্চে অ্যাপিয়ার হওয়ার ভঙ্গিতেই নায়িকা কুহেলিকা এবং অনুবর্তিনী মলি সেনের প্রবেশ লক্ষ্য করল হিমানীশ।

দরজা খোলাই থাকলো। মাদুর একটা পাতা ছিল। হিমানীশ বললো—বসুন। যেন অগত্যা।

মলি মাসী বসলেন। মোটা মানুষ। ব্যথা লেগেছিল বুঝি কোমরে।

কুহেলিকা বসেনি।

শুরু হল নাটক।

কুহেলী—কী ব্যাপার বল তো? এমনভাব দেখাচ্ছো যেন তুমি জানতেই না আমি আসব।

হিমানীশ—ঠিকই তো!

কুহেলী—লেখনি তুমি আমায় আসতে? চিঠি বের করে দেখাতে

হবে নাকি?

হিমানীশ—আচ্ছা আচ্ছা বসো তো আগে। তারপর ঝগড়া কোরো।

কুহেলী দরজাটার দিকে তাকালো একবার। হিমানীশ বুঝলো দরজাটা ওভাবে হাট করে খুলে রাখা উচিত হয়নি। বন্ধ করে দিল।

পরিবেশটা হালকা হয়ে এলো একটু। বুঝি বা অনেকটাই। মলি মাসী টয়লেটের হদিস নিয়ে চলে গেলেন। বলে গেলেন—একটু ফ্রেশ হয়ে আসি।

ওদের দুজনকে একটু কথা বলার সুযোগ দিয়ে গেলেন যেন।

কুহেলিকা এটুকুর মধ্যেই অসম্ভব স্বাভাবিক হয়ে নিল। বললো—এতটা ভয় পাবে তুমি ভাবতেও পারিনি। নাঃ, সাহস এ যুগে মেয়েদেরই।

হিমানীশ পরাজয় স্বীকার করার ভঙ্গিতে বললো—তা ঠিক। তবে গলার স্বরটা একটু ভারি করেই বললো—আমি তোমাকে কি আসতে বলেছিলাম? কীভাবে কেমন করে কাটাচ্ছি আমার দিনগুলো তারই একটা ছবি পাঠিয়েছিলাম। অকম্যা, নিষ্কর্মা ইত্যাদি আমার পৌরুষের প্রতি তোমার গালাগালগুলোর জবাব দিতে চেয়েছিলাম মাত্র। তবে হ্যাঁ লিখেছিলাম—যদি তুমি আমার এই রান্না করা, বাসন মাজা, জামা প্যান্ট কাচা ইত্যাদি নিত্যকর্মগুলো একবার চোখ মেলে দেখতে, সার্থক হতো আমার প্রচেষ্টা।

কুহেলী ফিক করে একটা ঠাট্টার হাসি মুখে-চোখে ছড়িয়ে নিয়ে বেশ একটু ট্যারা ব্যাঁকা করে বললো—ঘরটায় ঢুকেই তা বুঝেছি। পরিস্থিতির মোকাবিলায় তোমার গর্বোদ্ধত কর্মোদ্দীপনার সাক্ষী স্টোভের ওপর কেটলি, মেঝেতে হাঁড়িকড়ার গড়াগড়ি আর বিছানায় বইএর ছড়াছড়ি। ববার প্রেজেন্টেশন পেতেই পার তুমি।

মলি মাসী এসে পড়েছেন। কুহেলী বললো—বসো মাসী, হাতমুখ ধুয়ে আসি, একটু চা করে খেয়ে চলে যাব।

—রাত্রি হয়ে যাচ্ছে, যাবে কোথায়? হিমানীশের প্রশ্ন।

—মাসীর ভাইপো থাকেন জলপাইগুড়িতে। ওখানে চলে যাবো। দ্রুত টয়লেটের পথে পা বাড়ালো কুহেলী। মামুলি প্রশ্নের মামুলি উত্তর।

মলি মাসীকে এখন আর একটুও ক্লান্ত বা চিন্তিত মনে হচ্ছে না। বললেন—হিমানীশ, এ-ঘরটায় তো তুমি একা থাকো?

—হ্যাঁ।

—এ বাড়িতে আর কেউ থাকে না? এত বড় বাড়িতে তুমি একা?

—না না, তা কেন? এই পাশের ঘরটায় দু'জন থাকে।

একই অফিসে কাজ করি আমরা। ওরা উইক এণ্ডে বাড়ি চলে যায়। আজ তো শনিবার। চলে গেছে। সোমবার আসবে আবার। ও ঘরের চাবিটা আমার কাছেই আছে। ওখানেই আপনাদের শোবার ব্যবস্থাটা করতে হবে আজ। এত রাত্রে যাবেন আর কোথায়? নিচে একতলায় নেপালীদের দুটো ফ্যামিলি থাকে। ওরা ওখানে থাকতে ওপরে আমাদের কোন ভয় নেই।

কুহেলী শাড়ি পরে হালকা চালে এসে দাঁড়ালো হিমানীশের সমুখে। চটুল ভঙ্গীতে বললো—বলুন মশায়, কিসের ভয়? মেয়েছেলের? সত্যিই তো স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্....।

—না, মানে—

—মানে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। সরো। ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা ঝাঁটাগাছটা তুলে নিল হাতে। লেগে গেল সাফাইয়ের কাজে। কোন তরফেই কোন সমস্যা নেই যেন। সমাধান তো এভাবেই করতে হয়। বাজারের থলি একটা হাতে নিয়ে হিমানীশ বেরুল। বলে গেল নিচে থেকে কেউ এসে কিছু জিজ্ঞেস করলে বলো—মুখ থেকে হিমানীশের কথা কেড়ে নিয়ে কুহেলী খুশির হাসিতে বলে—মুলুকসে আয়ী। উন্‌কা দোস্ত।

হো হো করে হেসে উঠলো দুজনেই।

মজা লুটছে মলি মাসী।

মাসী বললো হিমানীশকে—আরে চা একটু খেয়ে যাও। কোথায় কি আছে বলো। করে নিই।

—ঐ তো সব আছে স্টোভের কাছে। দেখে নিন না। জল গরম হতে হতে আমি ফিরে আসছি। চলে গেল হিমানীশ।

চায়ের জল চাপিয়েছে মলি মাসী নয়, কুহেলী নিজেই। জল ফুটছে—সঙ্গে ভাবনাটাও। থুতনিটা হাঁটুতে ঠেকিয়ে চিন্তার সীমানা পেরিয়ে এলোমেলো ভাবনাগুলোকে পিছন-পানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে সে।

হিমানীশ ফিরেছে। অবাক্ কাণ্ড! এতটুকু সময়ে ঘরটার হাল ফিরিয়ে ফেলেছে কুহেলী। এ পারিপাট্যে বুঝি মেয়েদেরই একচেটিয়া অধিকার।

মলি মাসী ঘুম ঘুম চোখে মেঝেয় পাতা মাদুরটাতেই গড়াগড়ি দিচ্ছিল। মেজাজ করে চায়ে বসলো সকলে—মাদুরের তিন কোণে তিনজন।

প্লেটবিহীন কাপ। তাতে কি? বেটাছেলেদের সংসার এরকমই হয়। মন্তব্য করলেন মলি মাসী। দুটো করে সিঁঙ্গাড়া ঠোঙ্গা থেকে বের করে হাতে হাতে পরিবেশন করলো হিমানীশ।

রাত্রি পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল ক্রমে। কুয়াশার কালো ঘোমটা রাস্তার আলোগুলোকে সব আড়াল করে দিল বুঝি। জানলার ধারে পাতা চৌকিটায় পাতলা বিছানাটার মলিনতা ঢাকতে একটা সদ্য পাটভাঙা চাদর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তার উপর। তারই ওপর বসে কুহেলী নিরীক্ষণ করছে বাইরের কালোর কুর্নিশ—তার ভেতরের দলা পাকানো অন্ধকারগুলো বাইরের কালোর সংস্পর্শে এসে আরও ঘন আরও বীভৎস হয়ে তাল পাকিয়ে উঠেছে। সশব্দে জানলাটা বন্ধ করে দিল সে।

পাশের ঘরে মহিলা দুজনের নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ত রাত্রিযাপনের

ব্যবস্থায় কিছুটা সম্মার্জনীচর্চায় ধূলিনিবারণাদি কার্য সমাপনান্তে ফিরে এলো হিমানীশ আপন গৃহে। মলি মাসী খিচুড়ি রান্নার আয়োজনে ব্যাপৃতা।

কুহেলীর কাছাকাছি গিয়ে বসলো হিমানীশ। সহসা জিজ্ঞাসা করে বসলো তাকে—বাবার খবর কিছু জানো?

পিতৃপ্রসঙ্গের তাৎক্ষাণিকতায় নিজেকে যেন একটু অপ্রতিভ করে তুললো হিমানীশ। হঠাৎ ভারি হয়ে যাওয়া হাওয়াটাকে হালকা করে দিতে মলি মাসী বললেন—পতিতপাবনবাবু তো এখন শ্রীরামপুরেই আছেন। কয়েকদিন আগেও গিয়েছিলাম আমি ও পাড়ায়। দেখলাম, তো হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন। হাঁপানি তো? টানটা উঠলেই কষ্ট। ওষুধপত্র দিয়ে একটু উপশম এই যা।

হিমানীশ তাকে থামিয়ে বললো—-তা আমি জানি। চিঠি পেয়েছিলাম আমি তাঁর বেশ ক'দিন হয়ে গেল। লিখেছিলেন 'শরীরটা চলছে কোনমতে'। গতকাল ওঁর পাঠানো টাকা পেলাম এক হাজার।

থেমে যায় সে সহসা। ভাবে সেই টাকাতেই তো চলছে অতিথি আপ্যায়ন। নিজের রোজগারের এক পয়সাও তো আসেনি এখনও হাতে।

কুহেলী প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল না। বললো—কয়েকদিন আগের খবর আমি জানি। আগের থেকে খারাপ কিছু হয়নি ওঁর শরীর।

মলি মাসী পুনরায় হাল্কা চালে বললেন—বয়েস হয়েছে। ওঁর শরীরের কথা কি বলা যায়? এই ভাল, এই খারাপ। তাছাড়া আর যাই বলো বাবা, সনবিগ্রাহী মশায়ের সবটাতেই বাড়াবাড়ি। সন্ধ্যাহ্নিক না করে জলগ্রহণই করবেন না। ডিম-মাংস ছোঁবেন না। একাদশী করা চাই। হাসপাতাল, নার্সিং হোম এসব নাকি ওঁর জন্য নয়। বলেন, 'আমি তো মৃত্যুর দোর গড়ায়। অত টাকাই বা আমার কোথায়। এ বয়সে ঐ ম্লেচ্ছ পরিবেশ আমাকে কোন্ সুখটাই বা দেবে?' এ সব গোঁড়ামির কোন অর্থ

হয়? আর টাকা-পয়সার কথা অত ভাববার কি আছে, একটা ছেলে তো মুখধরা হয়ে উঠেছে।

মাসী আরম্ভ করলে আর থামতে চান না। হিমানীশ একপ্রকার জোর করেই থামিয়ে দিল তাঁকে। বললো—আপনি থামুন মাসীমা। বাবার ভাল লাগা, মন্দ লাগা নিয়ে কোন কথা বলবেন না। তাঁর সিদ্ধান্তের সমালোচনা সেটাও আমাদের অনধিকার শুধু নয়, অন্যায়। যাক্ সে কথা। আমি চিঠি দিয়েছি আজ। উত্তর এসে যাবে চার পাঁচ দিনের মধ্যেই। আপনাদের ব্যাপার কি বলুন, যেন দৌড়োতে দৌড়োতে চলে এসেছেন মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ, এক প্রকার তাই। ও তো একেবারে চাকরি বাকরি ছেড়েই হাজির হলো আমার কাছে। যা শুনলাম তাতে বুঝলাম আর এক মুহূর্তও ওখানে থাকা উচিত নয়। তাই, এখানে আসায় তোমার সায় আছে জেনেই চলে এলাম।

হিমানীশ গম্ভীর হয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর কুহেলীর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল—তোমার বাবা, তিনি কেমন আছেন?

—আগের মতই। আর কিছু বলতে পারে না কুহেলী। মলি মাসী বলে চলেন—ঐ তো প্যারালিসিস রুগী। তার কষ্টের কথা আর বলার কি আছে? সব কষ্টের বড় কষ্ট তো এই মেয়ে।

—চাকরি ছাড়লে কেন কুহেলী? সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করে হিমানীশ।

কুহেলীর মুখে নেই কোন কথা।

মলি মাসী বিবরণ পেশ করার ভঙ্গিতে বলে চললেন—

অফিস ছোট। মাইনেই বা কী? তবু কিছু তো আসছিল? তাই বা আসে কোথা থেকে? সব মানলাম। কিন্তু দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মালিকের ছেলের নজর যদি ও'রে গিলে ধরে সর্বক্ষণ! বেচারা দাঁড়ায় কোথায়? ওর বাবাই তো ঠিক করে দিয়েছিল কাজটা। তিনি ইজ্জত

বাঁচিয়ে চলতেই নির্দেশ দিয়েছেন শেষ পর্যন্ত। এবং তাঁর সম্মতিতেই এসেছি আমরা।

—তার মানে কি বলতে চাইছেন আপনারা? আকাশ থেকে পড়া জিজ্ঞাসা হিমানীশের।

—অবুঝ হচ্ছো কেন বাবা! সবদিকের শান্তিপূর্ণ সমাধান যাতে হয় সে ব্যবস্থা তো তোমাকেই করতে হবে। এক ঝলক অনুনয়ের হাসি ঝরে পড়লো মাসীর বাঁধানো দাঁতের কষ বেয়ে।

পরিবেশটা থমথমে হয়ে থাকলো কিছুক্ষণ।

এরই ভেতর স্টোভ জ্বেলে খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়েছে কুহেলী। একান্ত অনাড়ম্বর আনুষ্ঠানিকতায় আজ রাতের রন্ধন-ভোজনাদি মিনি মিনি ব্যবস্থায় সমাধা হলেও 'পিকনিকের মজা' বলে একটা বস্তু উপরি পাওনা হিসেবে লাভ করল সবাই।

এবার রাত্রিযাপন। শয়নপর্ব। পার্শ্বগৃহে মহিলাদ্বয়ের জন্য শয্যা রচিত। কিন্তু হাজার হোক ঘর অপরের, শয্যা-সরঞ্জামাদি সবই অপরের। স্বাভাবিক অস্বস্তির কথা তুলে বললেন মলি মাসী—আমরা এ ঘরেই থাকবো। যা হোক করে রাতটা কেটে যাবে। তুমি বরং ওঘরে যাও।

কুহেলীও সায় দিল মাসীর কথায়।

অগত্যা তাদের মতেই মত দিল হিমানীশ।

ঘুম নেই কুহেলীর চোখে—ঘুম সেই হিমানীশের। দুই ঘরে দুইজন। উভয়ের ভাবনার গতি প্রায় সমান্তরালে প্রবাহিত। কুহেলী মেয়েছেলে। লজ্জা তার সৌন্দর্য, সংকোচ তার ঐশ্বর্য, প্রেম তার স্বর্গীয় সম্পদ। এ সকল এতদিন সযত্নে রক্ষিত ছিল আব্রুর আবরণে। সহসা একটা ঝোড়ো হাওয়ায় ইজ্জত রক্ষার সে ওড়নাটা বেসামাল হয়ে গেল। দুর্লভ মর্যাদা তার সুলভে বিকাল। সান্ত্বনা খোঁজে। অচিরেই স্বপ্ন নামে চোখে। হিমানীশ সুপুরুষ, সু-মানুষ, শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব। প্রাণের পুরুষ রূপে করেছে

বরণ তারে সেতো বহুদিন আগে। শরমের বাধা গেছে ঘুচে। ক্ষতি কি? সেই শুভক্ষণ বুঝি উপস্থিত হয়েছে। সুরক্ষিত সুরভিত যা কিছু সম্বল তার উজাড় করে দেবার শুভলগ্ন। পরিতৃপ্ত সে নিজে—পরিতৃপ্ত হবে হিমানীশ।

আর হিমানীশ! কত অসহায় যেন। তার সংসারের ছবিটা বিশেষ একটা নিজস্বতা নিয়ে ভেসে ওঠে মানস-দর্পণে। স্বল্পবিত্ত বলি কেন, প্রায় বিত্তহীন পরিবার হলেও পুষ্টি তার অনন্য প্রাণরসে। বাবা তার দারিদ্র্যকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে অভিলাষের উচ্চ সীমায় প্রাণপ্রবাহে দুর্দমগতি। ছেলেরা তাঁর অনেক অনেক বড় হবে। হাস্যে লাস্যে ক্রীড়াচাঞ্চল্যে ভরপুর লালিত্যের আদর্শ তাদের সামনে এগিয়ে দিয়ে তাদের প্রাণে লহর বইয়ে দিয়েছেন দুর্বার। সুদৃঢ় প্রতীতি তাঁর—সুদিন খুবই সন্নিকটে। মা, ভক্তিমতী, সরলা, অবলা। ভাই-বোনেদের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধন। ...সৌভাগ্য দোরগোড়ায় বুঝি! গৃহাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার তাগিদে আনচান করছে যেন। সাধ তার কত—সাধ্যের সীমানা পেরিয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে স্বপ্নের আঙিনায়। এ অবস্থায় কুহেলিকা তার চোখে একটা ধোঁয়াশার সঞ্চার করেছে বৈকি! সমুখের সুদিনটাকে প্রত্যাখ্যানের নির্মমতা! ভাবতেও পারে না সে! এরকম একটা নিষ্ঠুর চিন্তারও শিকার হয়ে পড়েছিল বটে, তবে মুহূর্তে সেই স্বার্থপর ভাবনাটা বিবেকের অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে।

ভালবাসার নির্ভরতা এ যে! আবেগের আবিলতায় নয়, বিশ্বাসের অনির্বচনীয়তায় কুহেলী তার দেহ-মনের ঐশ্বর্য দেউলিয়া হয়ে সঁপে দিতে এগিয়ে এসেছে। তার মর্যাদা সে তো তার ন্যায্য প্রাপ্য। তা দিতে হবে। ওদিকে আবার বাবা-মার আগোচরে আবেগের বশে কিছু একটা করে বসা শুধু অশোভন নয়, নিকৃষ্টতা। তাজ্জব! ভাবতে ভাবতে শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। খট্ খট্ আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে দেখে মলি মাসী। পরণে তাঁর মানান-সই একটা শাড়ি। বাঙালী হিন্দু

ললনার একটা সাদা-মাটা বৈশিষ্ট্যে এক পেয়ালা চা হাতে এসে দাঁড়ালো হিমানীশের মাথাগোড়ায়।

কুহেলিকা আসেনি।

ও ঘরটা বন্ধ করে চা-টা হাতে নিয়ে তার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল হিমানীশ। কুহেলী নেই। বাথরুমে। মলি মাসী বললেন—আমি একটু জলপাইগুড়ি যাচ্ছি। সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসবো। কি ঠিক করলে বলো।

—ঠিক কিছু করিনি। এখন ফিরেই যান আপনারা। পরে ব্যবস্থা একটা হবে। হিমানীশের কথায় কোন মারপ্যাঁচ নেই। একান্তই সহজ সরল।

—ঠিক আছে, আমি আর দেরি করব না। কুহেলীর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। ফিরে আসি, তারপর যা হয় হবে। দরজা খুলে চললেন মলি মাসী। হিমানীশ নিচে পর্যন্ত গিয়ে একটু এগিয়ে দিয়ে এলো। ফিরো এসে বন্ধ দরজার কড়াটা নাড়ালো একবার সে।

কুহেলী দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল—কাপড় ছাড়বে বলে। ভিজে কাপড়েই দরজাটা খুলে দিল। ব্যাগ থেকে একটা শাড়ি বের করে দিতে বললো হিমানীশকে। সদ্যোস্নাতা তরুণীর ওপর থেকে কষ্ট হচ্ছিল চোখ ফিরিয়ে নিতে হিমানীশের। একটা আটপৌরে নীল শাড়ি ছিল তার পরণে। জল গড়িয়ে পড়ছিল। শাড়ি একটা বের করে তার হাতে দিয়ে হিমানীশ আবৃত্তির ঢঙে বলে উঠলো—'চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরান সহত মোর।'

কুহেলী 'ধ্যাৎ' বলে একটা সোহাগের হাসি হেসে দ্রুত লয়ে ফিরে গেল চানঘরে। চট্‌পট্‌ মুখ ধোওয়ার একটা ফরমাস জারি করে গেল হিমানীশের উপর।

কোনমতে ফরমাসটা তামিল করে টানটান হয়ে তক্তাপোশের ওপর শুয়ে পড়লো হিমানীশ।

নিজের হাতে তৈরি এককাপ চা একহাতে আর হাতে একটা প্লেটে বাড়ি থেকে আনা ভাজা চিঁড়ে-বাদাম নিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালো কুহেলী। হিমানীশকে একটা ঠেলাও দিল। উঠে বসলো সে। সাগ্রহে চা আর চিঁড়ে ভাজার প্লেট হাতে নিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সে কুহেলীর দিকে।

আটপৌরে বেশবাসে সত্যিই ভাল মানিয়েছে তাকে। কুহেলী বুঝে নিল তার এই স্বাভাবিক তরতাজা রূপটা দু চোখ ভরে পান করছে হিমানীশ। একটা চটুল হাসি মুখময় ছড়িয়ে দিয়ে বলল সে—কি দেখছে অমন করে? খেয়ে নাও।

হিমানীশ বললো—দেখছি মেয়েদের আসল রূপটা। 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়।'

প্রতিবাদের সুর কুহেলী একটা তুলেছিল বটে, বলেছিল—বাজে বোকো না। লাবণী না ছাই। কিন্তু সে চেয়েছিল হিমানীশের মুখে এরকম একটা প্রশস্তি। তাই খুব খুশি। হিমানীশকে প্রাতরাশটুকু করালো, নিজেও একমুঠো চিঁড়েভাজা মুখে দিয়ে চা খেতে বসলো পাশাপাশি। হিমানীশের উপবীত-শোভিত প্রশস্ত বক্ষ, পৌরুষ-প্রদীপ্ত বলিষ্ঠ চেহারায় আজ নতুন করে একটা আকর্ষণ অনুভব করছে না শুধু, রীতিমতো অহংকার, কবলিত হয়ে পড়েছে যেন। সংকোচের বাঁধ ছুটিয়ে প্রাণখুলে গাইতে ইচ্ছে তার —'তোমারই গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমারই রূপে'। সংযত করে নিল নিজেকে...... এ পুরুষকে ভাল লাগার অধিকার তার কতটুকু! দুশ্চিন্তার ধূসরতা ঝেড়ে ফেলে সাবলীলতার সৌরভে সুরভিত হয়ে সে নিজেকে মেলে ধরেছিল কিছুটা সময়।

হিমানীশও অপ্রস্তুত। একটু বেশী মাত্রায় আবেগ-চঞ্চল হয়ে যেন যাত্রার দলের প্রেমিকের অভিনয় করে ফেলেছে সে। কিছুটা ভাঁড়ামির পর্যায়েই যেন পড়ে গেছে সেটা। উভয়ের মাঝে নিস্তব্ধতা গুঁড়িশুঁড়ি মেরে বসে থাকলো কিছুক্ষণ। অল্পক্ষণের মধ্যে পরিবেশটা বেশ ভারি হয়ে

উঠলো। একটা সুষম বাতাবরণ তৈরি করতে চাইলো হিমানীশ। কুহেলীকে বললো—শোন, আমি এখন তোমার কাছে একটু সময়ের প্রার্থী। আমার থেকে দূরে আমি তোমাকে রাখবো না বেশিদিন। তবে এখন তোমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে। তারপর—

হিমানীশকে কথা শেষ করার সুযোগ দিল না কুহেলী। সুতীব্র ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠলো—এক্কেবারে অসম্ভব। আমার অবস্থাটা আমি বোঝাই কি করে? তুমি কি চাও একটা মদ্যপ, নারী-মাংস লোলুপ নরপিশাচ আমার দেহটাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাক। সুদক্ষ অভিনেত্রীর মতো কান্নাভেজা কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়েছে সে হিমানীশের দিকে। পৌরুষে তার খোঁচা দিতে চেয়েছে, বলেছে—সহিষ্ণু ভদ্রলোকে তুমি। তোমার ভালাবাসাকে টুকরো টুকরো করে কামনার আগুনে ঝলসে খাবে লাম্পট্যের ক্ষুধা। তা তোমার সহ্য হবে।

সত্যিই হিমানীশের অনুভবে জেগে ওঠে একটা তীব্র কোপানল। গলার জোর বাড়িয়ে থামাতে চায় কুহেলিকাকে। বলে—একটু থাম দয়া করে। এসব শুনতে পারি না আমি। মোকাবিলা সে তো আমি করেই রেখেছি। এখনই এই মুহূর্তেই তা কি করে সম্ভব? আমি নিরুপায়।

—আমার থেকে নিরুপায় নও তুমি হিমানীশ।

প্রতিবাদের সুরে বলে কুহেলিকা। বলতে থাকে—শয্যাসঙ্গিনী নাই করলে। তোমার এ অগোছাল, লক্ষ্মীছাড়া বাসাড়ে ব্যবস্থায় একটা কাজের লোকের ঠাঁই হতে পারে নিশ্চয়ই। অসম্ভব রকম কঠিন হয়ে যায় সে।

—এই এক ঘরে তুমি আর আমি কী পরিচয়ে থাকবো? আর বাড়িতেই বা আমি কি বলবো? এমন একটা অবাস্তব কথা বলছ যার কোন মানেই হয় না। হিমানীশ বুঝিয়ে বলার ভঙ্গিতে বলে।

হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে কুহেলিকা—ঠিক আছে। কালই যাব চলে। কপালে যা আছে তাই হবে।

কিছুক্ষণ ভারিমুখে বসে থেকে বাজারের থলে হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল হিমানীশ।

[*নিবারণবাবু দম নেবার জন্যে একটা সিগারেট ধরাল। পার্শ্বচর সঙ্গে নেই আজ। মন্তব্য একটা করতে পারলে মাথাটা হালকা হতো। ক্লান্তিটা কেটে যেতো অনেকটা। কাগজটা উল্টে দেখলেন 'ক্রমশঃ' আছে কিনা। নাঃ শেষ এ সংখ্যাতেই। পরের সংখ্যায় অন্য লেখা বিবাহের উত্তর। একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে বললেন—দেখা যাক্ এখন বিবাহ-সঞ্জাত সংঘাতটা কোথায় কিভাবে।*]

ফিরেছে হিমানীশ। বাজার থেকেই নাস্তার একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে এসেছে। কচুরি-আলুর দম-জিলিপি, অনেকগুলো রঙিন ছাপ-দেওয়া কাগজের প্লেটও এনেছে। ব্যাগের ওপর দিকেই ছিল ওগুলো। বের করে দিল কুহেলীর হাতে। কুহেলী বললো—এতগুলো প্লেট আবার আনতে গেলে কেন? আমরা তো আজকের দিনটা মাত্র।

হিমানীশ্ দেখলো কুহেলীর চোখগুলো জবাফুলের মত লাল হয়ে রয়েছে। বললো—মেয়েরা আর কিছু না পারুক, কাঁদতে পারে বাবা!

—কৈ কাঁদিনি তো। কুহেলীর অভিমানী উত্তর। হিমানীশের কণ্ঠ থেকে অর্থহীন একটা শব্দ বেরিয়ে এলো—হুম্!

এবার সেই মাদুর পাতা, জমিয়ে বসা।

হিমানীশ বসলো কিন্তু একা। কচুরি জিলিপি প্লেটে সাজিয়ে সামনে তার রেখে গেল কুহেলী। জিজ্ঞাসা করল—চা খাবে?

—তা খাব। কিন্তু আমি একা খাব বলে কি এগুলো এনেছি সব?

—আমার আছে। বলে রান্নার জোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো কুহেলী।

—না নেই। আমার সামনে এসে বসে খাও। নচেৎ এগুলো নিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। আদেশের সুরে হিমানীশ বলে।

অভিমান রেখে এগিয়ে এলো কুহেলী। হিমানীশের কথার অবাধ্য না হয়ে খেয়ে নিল তার ভাগেরটা। চা এক রাউণ্ড হলো। পরিবেশের

আড়ষ্টতাটাও গেল ঘুচে।

মেঘের কোলে রোদ উঠতে দেখা গেল।

কুহেলী যেন একটা গতিস্বাচ্ছন্দ্য লাভ করলো। কি আর হয়েছে এমন একটা ভাব। কাগজ পড়তে পড়তে রাত জাগা চোখে ঘুম নেমে এল হিমানীশের। হাতে মাথা রেখে মাদুরেই গা এগিয়ে দিয়েছে বেচারা। তক্তাপোশ থেকে একটা বালিশ টেনে এনে কুহেলী তার মাথায় গুঁজে দিয়েছে।

ভোজন পর্ব নির্বিঘ্নে মিটে গেছে। ছুটির দিনের মাধ্যহ্ন বিরতি উপভোগ করেছে দুজনেই বেশ একটা ভারি ঘুম ঘুমিয়ে নিয়ে। কুহেলী শুয়েছিল মেঝেতে হিমানীশ তক্তাপোশে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। মলি মাসীর দেখা নেই। চিন্তার কথা। সামনে রাত্রি। দুজনে একা। আইডেনটিটি কার কি!

বাইরে থেকে খটাখট্ জুতোর শব্দ পেয়ে দরজা খুললো হিমানীশ। ভেবেছিল মলি মাসী এসেছে বুঝি। দেখল তার বদলে এসেছে মাঝ-বয়সী এক ভদ্রলোক। নিচের এক নেপালী বৌ তাকে সঙ্গে করে এনে চিনিয়ে দিয়ে গেল ঘরটা। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন— আপনার নাম হিমানীশ সনবিগ্রাহী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। হিমানীশের সসম্ভ্রম উত্তর।

—আমি আসছি জলপাইগুড়ি থেকে। আপনাদের মলি মাসীর কাছ থেকে আসছি আমি। উনি আজকে আসতে পারছেন না। আগামী কাল কলকাতায় যেতে হচ্ছে তাঁকে। ওঁর স্বামী এসেছেন নিতে।

কুহেলী ভেতর থেকে কথাগুলো শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এলো দরজা-গোড়ায়—তার মানে?

একটা চিঠি পকেট থেকে বের করে তার হাতে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন—এতেই মানে টানে যা থাকার আছে। আমি এখন চলি। ভদ্রলোক প্রস্থানোদ্যত।

হিমানীশ ভদ্রলোককে থামিয়ে দিয়ে বললো—

আসুন, ভেতরে আসুন।

—না না, ভেতরে যাবো না, তাড়া আছে।

—আপনি কে?

—আমিই মলির স্বামী।

ওদের হাত থেকে একরকম নিজেকে ছিটকে নিয়ে দ্রুত নেমে গেলেন ভদ্রলোক।

চিঠিটা পড়লো দুজনেই। লিখেছেন হিমানীশকে—

আমার স্বামী খুঁজে খুঁজে এসেছেন জলপাইগুড়িতে আমায় নিয়ে যেতে। একটা বৈষয়িক ব্যাপার আছে। ভাল আমার একটা কিছু হলেও হয়ে যেতে পারে। সময়ের অভাবে দেখা না করে যাওয়ার কর্তব্যহীনতা মেনে নিয়েই চলে যেতে হচ্ছে। কুহেলীর ভাল-মন্দ তোমার হাতে।

ইতি—শুভার্থিনী

মলি মাসীমা।

হতভম্ব দুজনেই। দরজা বন্ধ করে হিমানীশ বসল চৌকির ওপর কুহেলী ঘরের এক কোণে রান্নার জায়গায় হিমানীশের দিকে পিছন করে।

হিমানীশ ভাবছে সমস্যা ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। আর কুহেলী? তার অভিযোগ মলি মাসীর ওপর। সে কি তাকে একা ফেলে পালিয়ে গেল? হিমানীশকে যতই সে নিজের করে ভেবে থাকুক—এভাবে রাত্রির নির্জনতায় একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে একাকী...... না না সে ভাবতে পারছে না। একটা অনিশ্চিত আশংকা তাকে পেয়ে বসছে ক্রমশ। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

নিজেকে খুব সহজ করে নিয়ে হিমানীশ ডাকলো কুহেলীকে—কুহু! কাছে এস।

অবাধ্য হল না কুহেলিকা। কাছে এল তার। অভয় দিয়ে বলল

হিমানীশ—ঘাবড়াচ্ছ কেন? আমি তো আছি। ডান হাতের তর্জনীতে কুহেলীর চিবুকটা স্পর্শ করল সে।

অনিশ্চয়তার শূন্যতা, মর্যাদারক্ষার ভীরুতা, নরশার্দূলের কবল থেকে আত্মরক্ষার ভাবনাগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে বুকের মাঝে যে ঘূর্ণী তুলেছিল, হিমানীশের সোহাগস্পর্শে তা যেন প্রতিহত হলো। তাই জলে ভরে গেল চোখ দুটো তার। টলটলিয়ে উঠলো। হিমানীশ হাত দিয়েই তা সস্নেহে মুছিয়ে দিয়ে বললো—ভয় নেই, যাও একটু চা কর। নিচে যাব একবার।

সহসা কড়ানাড়ার শব্দ। শব্দটা চেনা। কেয়ার টেকার ভবানীপ্রসাদের কব্জির নাড়াচাড়া এটা। দরজা খুলে অল্প ফাঁক করে দাঁড়ালো হিমানীশ। হ্যাঁ, ভাবানীবাবুই তো!

ভবানীবাবু একগাল হাসি হেসে বাংলাতেই বললেন, আরে—হিমানীশবাবু। আপনার জেনানা এসেছেন, সে কথাটা তো আমাকে বলবেন মশাই।

—না, মানে হঠাৎ—ইতস্তত করে হিমানীশ।

—চলুন ভেতরে। ওনার নাম-ধামগুলো নোট করে লিই। উনার সই ভি একটা লাগবে। সবে এসেছেন, এখানে থাকার নিয়মকানুনগুলো তো জানেন না। এসব জেনানা-ফেনানা রাখা বহত ঝামেলা। থানা-পুলিস ভি হয়ে যায়। তাই আমরা এসব এলাউ করি না। জানেন না, এসেছেন যখন তখন আর কি করা যাবে? পরে অন্য জায়গায় চলে যাবেন। চলুন।

ঘরের ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে হিমানীশ কি দেখে নিল। ভবানীপ্রসাদকে ডাকলো—আসুন প্রসাদজী!।

ভবানীপ্রসাদ একটা খাতা খুলতে খুলতে লক্ষ্য করলেন ঘোমটা ঝোলানো একটি মহিলা তাঁদের দিকে পিছন করে বসে আছে মাটিতে। সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করলেন—বলুন তো হিমানীশবাবু, উনার নাম কি!

হিমানীশ একটানে বলে দিল—কুহেলিকা 'সনবিগ্রাহী'।

—ওরে বাবা! আপনি লিখে দিন ভাই। উনার বয়স, আপনার সঙ্গে সম্পর্ক মানে 'Wife' ঐ যা যা আছে ফর্মে, কতদিন থাকবেন ইত্যাদি লিখে নিজে একটা সই করুন, উনার সইটা ভী করিয়ে দিন। আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি।

—না না, আপনি এখানে বসুন না। খাতাখানায় যা যা লেখার লিখে জে সই করলেন আর স্ত্রীর দস্তখতের জায়গায় কুহেলিকাকে দিয়ে 'কুহেলিকা সনবিগ্রাহী সই করিয়ে নিয়ে ভাবানীপ্রসাদের হাতে তা ফেরত দিল হিমানীশ এবং বললো—চেষ্টা করছি, চলে যাবো অন্য কোথাও। নিচের দরওয়ানদের বলে যান একটু লক্ষ্য রাখতে। বাইরের কেউ না সোজা ওপরে উঠে আসে।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, কিছু চিন্তা করবেন না। দায়িত্ব থাকলো আমার। চলে যাচ্ছিলেন, কি মনে করে ফিরে এলেন। বললেন—ছেলের চাকরির কথাটা মনে আছে তো দাদা? আপনার অফিসে—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওটা আমি দেখবো, আশ্বাস দিল হিমানীশ।

ভবানীপ্রসাদের প্রসাদ লাভ করে হিমানীশ ধপাস্ করে বসে পড়লো বিছানায়। জলে একগ্লাস চাইলো কুহেলীর কাছে।

শশব্যস্তে কুহেলী একগ্লাস জল এনে ধরলো হিমানীশের সামনে।

চুমুক দিয়ে এক নিঃশ্বাসে পান করে নিল সে। ঠোঁটের কোণে রা টেনে বললো—চমৎকার!

—কী চমৎকার? কুহেলিকা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসার চাউনি তুলে ধরে হিমানীশের মুখে। বলে—ভুল করলাম কিছু?

—না না ভুল কি? এতো ঈশ্বরের অভিপ্রায়। বাবা বলেন— "সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা। মানতাম না এ সব। এখন দেখছি না মেনে উপায় নেই।

জিজ্ঞাসু চোখ দুটো নামাতে পারে না কুহেলী। হিমানীশ বলে

চলে—বাবা বলেন আমি নিমিত্ত মাত্র, আমাকে দিয়ে কিছু করানো হচ্ছে মাত্র।" আগে এ সকল কথার অর্থ বুঝতাম না। আজ বলতে ইচ্ছে হচ্ছে—ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

কুহেলীকে পাশে বসিয়ে বলে – বিধির বিধান বুঝি লঙ্ঘনের নাহি অধিকার।

কুহেলীর মুখে একটা কৌতুক হাস্যের আভা। হিমানীশ বলে—আমি এসব ঘটনাকে হিন্দী সিনেমার প্লট বলে ট্যাবা হাসি হাসতাম এককালে। এখন ভাবছি, নির্বোধের মতো নিজেকে বুদ্ধিমান ভেবেছি এতকাল। যাক্ পেটটা তো ভরাতে হবে। নিয়ে আসি কিছু। ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে—ব্যাগটা বাড়িয়ে দাও প্রিয়া।

এবার কুহেলী কিন্তু সত্যির হাসি একটু হেসে ব্যাগটা তুলে দিল হিমানীশের হাতে। বাজার ফেরত হিমানীশকে খুশির আমেজে ডগমগ দেখে কুহেলীর বুকের ভেতর কিসের যেন একটা সন্ত্রাশ দাপাদাপি শুরু করে দিল। যথাসম্ভব সামলে নিয়ে ব্যাগে হাত দিতে যা হাতে পড়লো তা দেখে বিহ্বলতা নয়, রোমাঞ্চ নয়—'বুক করে দুরু দুরু' এরকম একটা ভাব। বস্তুটা হোল একগোছা রজনীগন্ধা। কোথায় রাখবে? জায়গা কোথায়? বিছানাতেই রাখলো।

রাত্রের রান্না-খাওয়া-দাওয়া সব কিছু যন্ত্রচালিতের মত করে গেল কুহেলিকা। সারাক্ষণই একই চিন্তা ভ্রমিতেছে মনে—কেমনে পোহাবে হেথা আজিকার নিশি।

হিমানীশ নিজহাতে রচনা করিল শয্যা। পুষ্পিত করিল তাহা।

একটা সিঁদুরের কৌটো কুহেলীর হাতে দিয়ে বললো—সিঁথিতে বেশ ডগডগে করে পরে নাও।

সারা শরীরটা যেন হিম হয়ে এল কুহেলীর। বললো—একাজ তো আমার নয়। দাও তবে, নিজের হাতে পরিয়ে দাও আমায়।

—বেশ তাই হোক্। হিমানীশ কোলের কাছে টেনে নিয়ে তাকে

সিঁথিতে এঁকে দিল সিঁদুরের রেখা। ঘোমটাটাও টেনে দিতে ভুললো না।

একটা আকস্মিকতার মধ্যে জীবনের এতবড় একটা পর্ব সমাধা হয়ে গেল। ভবিতব্য তবে কি এটাই! এব শুভাশুভ বিচার করবে উত্তরকাল।

বিধাতার অনুগ্রহে আপন ভাগ্য জয় করিবার অধিকার বুঝি অল্পায়াসেই লাভ করলো কুহেলিকা। এয়তি-সুলভ গতিস্বাচ্ছন্দ্য একটা অনুপম সুষমা এনে দিল তার দেহে মনে। কিন্তু বাঙালী ঘরের লজ্জারাঙা অধরোষ্ঠের পেলবতায় কোথায় যেন একটা ঘাটতি। সেটা মুখ ফুটে না বললেও অনুভবে ধরা পড়ে হিমানীশের। তবে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো ছাড়া উপাযই বা কী!

মাইনে পেয়েছে হিমানীশ। প্রথম রোজগার। কামিনীর সাথে কাঞ্চনেব অশুভ আঁতাত ঘটল বুঝি। যুগ্ম প্রভাব। মোহমেদুর মৃদু একটা চিত্তচাঞ্চল্য নয়, যেন একটা উন্মাদনাব উগ্রতায় মাতাল করে তোলে তাকে। অনিয়মের উচ্ছলতায় হাবুডুবু। অফিস কামাই হয়ে যায় প্রায়ই। ওমব খৈয়ামী মেজাজ পেয়ে বসে তাকে। না, সরাবের পেয়ালা নয়, কুহেলীর রূপের মদিরাই মাতাল করে দেয় তাকে।

সুখশ্রান্তিও কুহেলীর অসহনীয় হয়ে ওঠে। আশঙ্কা—এত সুখ তা সহিবে কি হায়!

একটা ঘূর্ণীঝড়ের এলোপাথাড়ি ঝাপটায় ক্ষতবিক্ষত হিমানীশ। পৌরাণিক যাত্রাপালার বিবেক নির্দেশ হেন নিয়তির অট্টহাস্যে ফুটে ওঠে ভূৎ আর ভবিষ্যৎ তার। ......ভাবিয়ে তোলে তাকে, জীবনবৃত্তের পরিধিটা তার এত সংকীর্ণ হয়ে গেল কি করে? জঘন্য স্বার্থপরতা, এমন ভোগ-বিলাসমত্ততা তাকে পেয়ে বসলো কি করে! মন তার ক্ষিপ্র বেগে ছুটে যায় আপন কুলায়ে। সেখানে তার মা-বাবা, ভাই-বোন বিত্তহীন ছোট্ট পরিবার তারে ঘিরে কত স্বপ্ন করেছে রচন। ......আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি খোঁজে। পায় না। 'বিধির বিধান' বলে স্বস্তি খোঁজে।

পায় না, বাজে কথা, ওটা পাপীর পাপ ঢাকবার একটা মিথ্যাশ্রয়িতা ছাড়া কিছু না।

বিব্রত হিমানীশ। বিরক্ত হিমানীশ। নিস্তেজ হিমানীশ। ঘর্মাক্ত চিন্তা কুণ্ডলিত হয়ে ললাটের বলিরেখা ভেদ করে সারা মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে তার।

কুহেলীর সাহসে কুলোচ্ছে না—কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করে।

বেশ কয়েকটা দিন গেছে কেটে। আজ অফিসে এলো হিমানীশ। চেহারাটায় একটা অবসাদের আস্তরণ। পরিবেশটা আড়ষ্ট গুমোটে কেমন যেন ফ্যাকাশে। ঝড় একটা উঠবে বুঝি!

ম্যানেজার মিঃ বাস্থর-গুরুগম্ভীর পদধ্বনিতে অফিসশুদ্ধ সবাই একটু নড়েচড়ে বসলো। হিমানীশও।

মিঃ বাসু আর সবাইয়ের ওপর কিছু-না-কিছু ফরমায়েস জারি করলেন। হিমানীশের শঙ্কিত মুখমণ্ডলে তাঁর একটা বক্র চাহনি নিক্ষিপ্ত হলো শুধু। কাজের কথা কিছুই বললেন না। গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন—আমার ঘরে একবার আসবেন।

হিমানীশ এসেছে। ক্ষমাপ্রার্থীর মত উপস্থিত করেছে নিজেকে মিঃ বাসুর টেবিলের সামনে। না কোন অশোভন আচরণ নয়। সমানের চেয়ারে তাকে বসিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—দেখুন হিমানীশবাবু, এটা সওদাগরি অফিস। এভাবে উইদাউট নোটিশে কামাই করবেন না। দিস ইজ ফার্স্ট টাইম। সামলে নিচ্ছি আমি। এরপর একটু সাবধানে চলবেন। ....হ্যাঁ আপনার একটা টেলিফোন মেসেজ আছে। গতকাল আপনার মামা ফোন করেছিলেন। আপনার বাবা অসুস্থ। আজই রাত্রের ট্রেনে বাড়ি চলে যান। দেখে আসুন। চাকরির ভয় নেই। আমি আছি। ফরম্যাল একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে যান শুধু।

বজ্রাঘাত তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে বিনা মেঘে নয়। এরকম একটা আশঙ্কা তর্জনী তুলে হুশিয়ারি দিয়েছে তাকে একবার নয়

বারবার। বলেছে—এই কি সময়? কিন্তু সংযত হতে পারেনি। বশে আনতে পারেনি তার ভেতরের সদ্য-জেগে-ওঠা বাসনাটাকে। কিন্তু পরিস্থিতির দায়ও তো কম নয় তাতে।

[*নিবারণবাবু থমকে দাঁড়ান কিছুক্ষণ। ভাবতেই হচ্ছে—বিব্রতবাবু তাঁকেও তো কম বিব্রত করে তুলছেন না। ছেলেগুলো এত দুর্বলচিত্ত হয় কি করে? আর মেয়েগুলোই বা এত নির্লজ্জ হয় কি করে? নেহাতই প্রবৃত্তির তাড়না। তার ওপর সভ্যতার বিবর্তন এদের এগিয়ে দিচ্ছে—সুযোগ করে দিচ্ছে। 'লোকভয়' সব ক্ষেত্রে কুফল এনে দেয় না। সুফলের দিকও তার একটা ছিল। আজকের সমাজেকে কাকে গ্রাহ্য করে! চরিত্র সুরক্ষাতেই যুবশক্তির বলিষ্ঠ বিকাশ—একথা উপলব্ধি করার বাতাবরণ কি পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে! নারীও কি সস্তা পণ্য হয়ে উঠেছে আমাদের দেশে? একের কাছ থেকে পালিয়ে আর একের কাছে ছুটে এসো প্রেম নামক বস্তুটির তারল্যে অবগাহন করে পুরুষকে আকর্ষণ, এবং তাকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা—এদেশের নারীচরিত্র কি এতই নিকৃষ্ট ছিল কোনদিন কোন কালে! দেখা যাক্, বিব্রতবাবুর হাতে আলোচ্য বিয়েটার পরিণতি কোন্ কথা বলে!*]

রাত্রির ট্রেনেই ফিরছে হিমানীশ সস্ত্রীক। গাড়ির দোলনে ঘুম নেমে আসতে চাইছে চোখে। আসছে না। পাশাপাশি বসা দুজনেই ঝিমুচ্ছে। সামনে বসা দুই প্রৌঢ়ের আলাপচারিতায় উভয়েই অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে মাঝে মাঝে, কখনও বা হাই ভেঙে ভারমুক্ত হবার চেষ্টা করে।

প্রৌঢ়দ্বয় উভয়েই ছিলেন পূর্ববঙ্গীয়। একজনের উক্তি বেশ ঝাঁঝালো—সখেদ। অপর জন কখনও সায় দিচ্ছেন, কখনও সামাল দিচ্ছেন।

প্রথম জন—এই যে আমাদের শম্ভু। তার কথাই কই—কী মেধাবী ছাত্র আছিল। সব শ্যাষ হইয়া গেল। কত্ত বড় হওনের কথা। হইলডা

কি?

দ্বিতীয় জন—আক্ষেপ করিয়া কী হইবে কও। দিনকালডা কী পড়সে। চাকরি তো একটা পাইয়া গেছে তবু।

প্রথম জন—হ। চাকরি! সওদাগরি আফিসের কেরানীগিরি।

ওডা কী একটা প্রফেশন অইল? ক্লাশে কখনও সেকেণ্ড অয় নাই যে ছেলে—। কয় স্ট্রাগল করসে। মানি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ করতে পারি নাই। আমাগ সংসারে কষ্টে-সৃষ্টেই লেখাপড়া করতে হয়।

দ্বিতীয় জন—বেশি কি আর আশা কর? বি. এ. পাশ করসে। এই বাজারে চাকরিও একটা জুটাইয়া লইসে। হ্যাঁ, দোষের কথা, তুমি কইতে চাও বিয়া একটা করিয়া ফ্যালসে। তা কী আর করা? আজকাল ওডা কোন অঘটন নয়।

প্রথম জন—ঠিকই কইস। এক্কেরে স্বাভাবিক। মেধা, একাগ্রতা, মনোনিবেশ সব বিসর্জন দিয়া অসংযতচিত্ত বিংশতি বর্ষীয় কিশোর দ্বাবিংশতি-বর্ষিয়া শিকারী যুবতীর পাণিগ্রহণে জীবনডারে ধন্য করিয়া লইসে।

দ্বিতীয় জন—থাম দিহি। ও সকল কথায় কাম নাই, যুগের যেমন হাওয়া সেই মত অইবে তো? অযথা কষ্ট পাও ক্যান্, ছাড়ান দ্যাও, ছাড়ান দ্যাও। অন্য প্যাসেঞ্জারদের ঘুমের ব্যাঘাত করিয়া লাভ নাই। ঘুমাও একটু।

সত্যিই হিমানীশ-কুহেলীর কানের পর্দা লাল হয়ে উঠেছিল। যেন ওদের লক্ষ্য করেই কথাগুলো ছুঁড়ে মারা হচ্ছিল।

রাত্রি গভীর। কামরাটা ঘুমে নিথর। কুহেলীর চোখে ভারী ঘুম চেপে বসেছে। হিমানীশ তন্দ্রাচ্ছন্ন। একটাই চিন্তা—বাবা কেমন আছে। কু-টাই জেগে উঠছে বারবার!

ব্যান্ডেল স্টেশনে নাস্তাপানি সেরে অদূরবর্তী বাঁশবেড়িয়ায় দূর

সম্পর্কের এক মাসীর বাড়িতে কুহেলিকাকে নিয়ে গিয়ে উঠলো হিমানীশ। বিয়েটা যে তার একেবারে বাসী হয়ে যায়নি মাসী তা বুঝলো। মেয়েরা নাকি সবে সিঁথিতে সিঁদুর চড়ানো মেয়েদের চেহারাতে নবোঢ়ার টাটকা ভাবটা সহজেই বঝে নেয়।

তাই হিমানীশকে বললো—'সবে বে করেছিস বুঝি?'

হিমানীশ 'হ্যাঁ' বলে একটু হাসলো কেবল। বাবার খবর জিজ্ঞেস করল সে।

মাসী বললো—কে কার খবর রাখে বাছা! একলা একধারে পড়ে আছি। ছেলেটা তো বদলী হয়ে চলে গেছে আসানসোলে। বউ নে চলে গেছে। শ্রীরামপুরে গেলে তোদের বাড়ির খপরটা-আসটা নিয়ে আসতো। অনেকদিন কোন খবর পাইনি। তোর মামারও তো চাকরি শেষ হয়ে ে। একদিন ডানলপের আপিসে কি কাজ ছেল—এয়েছেল। রাস্তায় দেখা। চাকরি হয়েছে তোর, বাইরে গেছিস বললো, বে করেছিস বললো না তো কিছু। আর বলবেই বা কখন? দু'তিন মিনিটের তো দেকা। হঠাৎ থেমে গিয়ে মাসী বলে—এই দেখো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল কতাই বলছি। ঘরের ভেতরে চল্। বোস্, চা করি।

হিমানীশ বলে—বসবো না, চা-ও খাব না এখন। বৌ-কে রেখে যাচ্ছি আজ তোমার কাছে। কাল এসে নিয়ে যাবো। বাবা অসুস্থ খবর পেয়ে আসছি। চুঁচড়ো হয়ে যাবো। ওখানকার এক ডাক্তার ওনাকে দেখেন। অসুবিধে বুঝলে জোরজার করে হাসপাতালে ভর্তিও করে দিতে পারেন। ঘুরেঘারে খোঁজখবর নিয়ে ফিরব বাড়ি। তাই।

—তা থাক না। ঘর তো ফাঁকা। থাকুক না ক'দিন আমার কাছে।

চা না খেয়েই হিমানীশ রওনা দিল। একান্ত আপনজনের মতই মাসী আদর করে নিয়ে গেল বৌকে আন্দরে।

না, ডাক্তার কাকার সঙ্গে চুঁচড়োতে দেখা হয়নি হিমানীশের। শ্রীরামপুর গেল চলে। স্টেশনেই দেখা হলো তাঁর সঙ্গে। হিমানীশকে

দেখে মুখের আদলটা তাঁর কঠিন হয়ে উঠলেও মুহূর্তে সমবেদনায় তা ভিজে গেল। তার পিঠে হাত রেখে বললেন—বড় দেরি করে ফেললে বাবা!

চীৎকার করে কেঁদে উঠলো না হিমানীশ। শিলিগুড়িতেই তার অনুভবের দরজা ভেদ করে মরমের পর্দায় এ খবরটা যেন একটা নিকষ কালো আঁচড় বসিয়ে দিয়েছিল। ডাক্তার কাকার সান্ত্বনার পরশে এখন শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে গেল কিছু, ঠোঁটদুটো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। কয়েক ফোঁটা গাঢ় উষ্ণ চোখের জল গণ্ড বেয়ে নেমে এলো শুধু।

ডাক্তারবাবু সঙ্গে লোক দিয়ে রিকশা করে শ্মশানঘাটের দিকে রওনা করিয়ে দিলেন হিমানীশকে।

জগদীশ সনবিগ্রাহীর মহাপ্রয়াণে শ্রীরামপুর চত্তরে শোকের নিষ্প্রাণতা প্রতিটি বায়ুকণাকে নিঃসাড় করে দিয়েছে যেন।

চিত্তের অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণ করতে করতে হিমানীশ যখন এসে পৌঁছলো শ্মশান ঘাটে তখন সব শেষ। বাবাকে দেখতে পেল না সে। ভস্মের আবরণে ঢাকা তাঁর দেহাবয়বটা কেবল ভেসে উঠলো তার চোখের সামনে। মা-ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সবাই।

পিতৃ-আত্মার শান্তি কামনায় চিতায় তাঁর শেষ তিন কলস জল ঢেলে দিল হিমানীশ। পিতার আত্মা কতখানি শান্তি পেল জানা যায়নি, তবে পুত্রের চিত্ত-প্রদাহ প্রশমিত হয়েছিল অনেকখানি।

পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ জগদীশ সনবিগ্রাহীর শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে। অজস্র জনসমাগমে মুখর হয়ে উঠেছিল শ্রাদ্ধবাসর।

হিমানীশের মাতুলের ইচ্ছানুসারে এবং মাতৃ-আদেশে কুহেলিকাকে

আনা হয়েছে এবং যথাযথ মর্যাদায় বধূকে ঘরে তুলে নেওয়া হয়েছে। আত্মীয়-পরিজন গ্রামবাসী কেউই এ বিবাহে কোন মন্তব্য করেনি। করতে চায়নি। নারী-পুরুষের বাছ-বিচারহীন মিলনের পক্ষেই যখন আধুনিকতার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তখন কোন বিবাহ বিষয়ক বিপর্যয়ে কারো মাথা না ঘামানোই ভাল এটাই-ভেবেছে সবাই। সবার ঘরেই তো ছেলেমেয়ে আছে। কে জানে কার ভাগ্যে কী আছে!

মাতুল কিন্তু ক্ষমা করতে পারেনি হিমানীশকে। ভাগীনেয় ছিল তার কাছে অহংকার। তার এই অশোভন অশালীন ক্রিয়াকলাপ তাকে আঘাত করেছে খুব বেশি।

একান্তে হিমানীশকে ডেকে নিয়ে নিজেকে কিছুটা ভারমুক্ত করতেই যেন কয়েকটা শক্ত কথা বললেন তিনি। বললেন—তুমি কি জান, তোমার বাবার মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী?

হিমানীশ নির্বাক্!

মাতুল বলে চললেন—কুহেলিকার মলি মাসীর স্বামী তোমাদের বিবাহ-বার্তা বর্ণনা করেন তীর্যক কটাক্ষে তোমার বাবার কাছে। কুহেলিকার ঐ মেসো শুনেছি, কুহেলিকা যে মালিকের কাছে কাজ করতো তার ছেলের বন্ধু। উদ্দেশ্য তার কি ছিল জানি না। তবে এই অসহ্য আঘাতেই ঘটলো তোমার বাবার মৃত্যু। বুকখানা তার দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেল। আক্রান্ত হলেন স্ট্রোকে। পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

হিমানীশ নিরুত্তর। নিস্তব্ধ।

এক সময় সংসারে সবাইকে নিয়ে বসে হিমানীশের মাতুল মহাশয় সবিস্তারে ঐ পরিবারের পথচলার একটা নির্দেশিকা উপস্থাপিত করলেন।

হিমানীশের ছোট ভাইটার লেখাপড়ার ভার তাঁর। ছোট বোনটারও চাকরি একটা হয়ে যাবে আশা করা যাচ্ছে। স্থানীয় স্কুলে একজন মহিলা পিওন নেওয়া হবে। রমা দরখাস্ত করেছে। কমিটির সবাই সনবিগ্রাহী

মশায়ের প্রয়াণে মর্মাহত। তাঁর অনূঢ়া কন্যার কথা ভেবে সহৃদয়তার সঙ্গে বিষয়টা দেখছেন প্রত্যেকেই। কাজটা পেয়ে গেলে ওকে আর কারো বোঝা মনে হবে না। ওর বিয়ের জন্যেও আর বিশেষ মাথা ঘামাতে হবে না ভাইদের। এবার আসছে হিমানীশের মায়ের কথা। তাঁর চলবে কি করে? বিঘে তিনেক জমি আছে। ভাগে ভুতোয় দিয়ে চাষ-বাস করিয়ে চালিয়ে নিতে হবে—এই হল মাতুলের প্রস্তাব।

এরপর বোনের কী ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। হিমানীশের মা বললেন—হিমু বিদেশে সংসার পেতেছে। আশীর্বাদ করি ওরা সুখে থাকুক। সেখানে ওদের অনেক খরচ। আমার ভাবনা ওকে ভাবতে হবে না। ওর পয়সা যার ভোগে লাগার কথা তা যখন লাগলো না, তখন আমি ভোগ করব কোন্ সুখে? কাজেই দাদ মাথা হয়ে যে ব্যবস্থা করছে সেই মতই চলুক—এই আমার ইচ্ছা।

হিমানীশ কী যেন একটা বলতে চাইলো। বাধা দিয়ে মাতুল বললেন—কিছু ভেবো না বাবা। মা তোমার, ভাই-বোন তোমার। সবই ঠিক থাকছে। বৌমাকেও আঘাত করতে চাইছি না আমরা কেউ। তুমি নিশ্চিন্ত মনে কাল কর্মস্থলে রওনা হও। মেয়েছেলে নিয়ে বিদেশে থাকা—সাবাধানে থেকো।

হিমানীশ ভাবতে থাকে—মাতুল তাদের সংসারের পাশে চিরকালই আছেন। ব্যবস্থাও তাঁর পাকা। কিন্তু সংসারের সমূহ দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে যে শাস্তি দেওয়া হলো তাকে তা সে সহ্য করবে কেমন করে? তার রোজগারের পয়সা লাগবে কোন্ পূজায়?

[আনাদি আজ পাশে নেই অগত্যা নিবারণবাবু মানসীর চায়ের দোকানে এসে আর এককাপ চা নিয়ে চুমুক দিয়ে পেট খোলসা করে একটা মন্তব্য করলেন মানসীকে উদ্দেশ করেই। বললেন- —তোমার বিব্রত বাঁড়ুজ্যেকে বলো, লিখছেন তো ভালই, তবে লিখে কি হবে? উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কো-এডুকেশন। আঠারোয় ভোটাধিকার। অর্থাৎ ঐ বয়সেই ছেলেমেয়েদেব নিজস্বতার স্বীকৃতি যে কোন রকমেব বিধি বিধান না মেনে চলবার অধিকার পাচ্ছে তারা। মেধা উন্মেষের প্রাগ্‌মুহূর্তেই অবক্ষয়ের আশংকা। সংস্কারের নামে স্বেচ্ছাচার-সঞ্জাত ক্যানসারের যে ক্ষত সমাজদেহে ছড়িয়ে পড়ছে তা কি দীর্ঘশ্বাসের তুবড়ি ফাটিয়ে রুখে দেওয়া যাবে?]

[যথা নিযমে পরবর্তী প্রতিবেদন বেরিয়েছে এবং যথারীতি এ সংখ্যাটাও কিনে নিবারণবাবূ পড়তে বসেছেন। পাশে অনাদিবাবু।]

প্রতিবেদন তিন

বিবাহের উত্তর

কলকাতার অদূরবর্তী শহরতলীর এক পল্লী পরিবেশের বাসিন্দা শুভঙ্কর নিয়োগী। মধ্যস্বত্ব বিলুপ্তির পর নিষ্কর বা মালের জমি সামান্য দু-চার বিঘে যা ছিল তা সবই চলে গেছে। আছে বাস্তুটুকু আর দেবোত্তরের দরুন যৎসামান্য সরকারি বৃত্তি। ধড়িবাজি তাঁর ধাতে নেই। একান্তই সহজ সরল। স্বল্পে সন্তুষ্ট। নির্লোভ নির্ঝঞ্ঝাট জীবনেই তাঁর স্বস্তি। লোকে বলে অক্ষমের সান্ত্বনা, তা বলুক, তথাপি পাকা বাড়ির চাতাল অপেক্ষা গোবর নিকোনো মাটির বাড়ির উঠোন তাঁর কাছে অধিক উপভোগ্য। উপাদেয়ও বটে।

শুভঙ্করবাবুর দুই ছেলে দুই মেয়ে। প্রথম মেয়ে তারপর ছেলে তারপর মেয়ে তারপর ছেলে—এইভাবে গাঁথা। যজমানের পূজাপাঠ

করেন আর একটা মুদিখানায় খাতা লেখেন। এভাবেই যে ভাবে চলার চলে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও নিরুদ্বেগ তিনি। ভাবখানা এমন—'আমি কারো খারাপ করিনি—আমার খারাপ হবে কেন?'

স্ত্রী সরমা দেবী খুঁজে পান না কি ভালটা এ পর্যন্ত হয়েছে আর কি ভালটাই বা হবে পরে! বড় মেয়েটাকে যা হোক ভিক্ষে-দুঃখু করে পাঁচজনের সাহায্যে পার করা গেছে। পাত্রটি অবশ্য ভালই পাওয়া গেছে। কিন্তু তারপর বড় ছেলে সোমু বি. এ. পাশ করেছে, বি. এড. টাও করেছে, তাও সুদখোর মধু বক্সীর সাহায্য সৌজন্যে। কিন্তু চাকরি-বাকরি একটা জুটছে কোথাও? ছোট মেয়েটাকে আর পড়ানো গেল না। এইচ. এস. পাশ করে ঘরেই আছে। বিয়ে থাই বা হবে কি করে? টাকা কোথায়? ছোট ছেলে নীলু ওরই সঙ্গে একসঙ্গে পড়তো। তাকে কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। সোমুই সে ব্যবস্থা করেছে।

সোমনাথ হরেক রকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে—কাজকর্ম যদি একটা জুটিয়ে নেওয়া যায়। সংসারের সুরাহা হয়। স্কুল মাস্টারির জন্যে তো কত চেষ্টা করল। অনার্স আছে, বি এড় আছে। তাতে কি? টাকা তো নেই। আজকাল স্কুলে মাস্টারি চাকরি পেতে হলে অনেক টাকা ডোনেশন লাগে। দুটো টিউশানি করে সে। ভাবে, কতলোক কতরকম কাজ করেই তো পয়সা রোজগার করে। হোক উঞ্ছবৃত্তি, আপত্তি নেই তার। তাই বা পাচ্ছে কোথা সে হাতের কাছে?

একবার অবশ্য পেয়েছিল সে পয়সা রোজগারের একটা রাস্তা। স্কুলে স্কুলে বই পাঠ্য করিয়ে দেওয়ার কাজ। পাঠ্য করাতে পারলে ভাল পয়সাই পাওয়া যাবে এরকম একটা আশ্বাসও পেয়েছিল সে। কেন না যে প্রকাশকের কাজ, তিনি কাজ করিয়ে ঠকান না কাকেও। কিন্তু সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কাজ করা গেল না। প্রথমটা সহানুভূতি দেখিয়েছে অনেকেই চেনা-অচেনা অনেক শিক্ষকই। পরে পরে দেখে কি, বই পাঠ্য করাতে গেলেও অনেক অনেক টাকা লাগে। বইএর মানের কোন বালাই

নাই। তা বিচার করার সময়ই বা কোথায় আর মেজাজই বা কোথায় কার? প্রকাশ্যেই কত স্কুল অথরিটি এবং শিক্ষক মহোদয়কে টাকার কথা বলতে শুনেছে সে। নমুনা পুস্তকের সঙ্গে টাকার গোছা ধরিয়ে দিতে হয় তবে কাজ হয়। লজ্জায় ঘেন্নায় ছিট্‌কে পালিয়ে এসেছে সে ঐ পথ থেকে।

শুভঙ্কর নিয়োগী ছেলেদের কথা অতটা ভাবেন না। একেবারে মুখ্যু তো নয়। পেটে কিছু আছে। যা হোক কিছু করে খেতে পারবে, কিন্তু মেয়েটার কি হবে? কোথায় টাকা, কোথায় পয়সা! সোনাদানাও তো একআনা নেই ঘরে। কী করে উদ্ধার হবে? সমাজ-সংস্কারক আর দেশ-সেবকের দল অবশ্য পথ যে বাতলাচ্ছে না তা নয়। বলছে—নারী প্রগতির যুগ। সংগঠিত হতে হবে তাদের। পণপ্রথার বিলুপ্তি তাদেরই ঘটাতে হবে। নারীমুক্তি আন্দোলনে সোচ্চার হয়ে উঠতে হবে তাদেরই। মিটিং-এ মিছিলে ফেটে পড়ছে এ সকল গালভরা হিতৈষণা। তবে স্লোগ্যানের বোমাবাজি করছেন যে সকল আদর্শবাদী দেশব্রতী তাঁরা কিন্তু আপন মেয়ের বিয়েতে সোনাদানা অর্থাদি যৌতুক দিতে এতটুকু পিছু হঠছেন না। এরকম নজীরের অভাব নাই। স্বজন পোষণের বিরোধিতায় মুখর তাঁদের বক্তৃতা। খোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে কোন ভদ্রমহিলাকে পুত্রবধূ করে আনার স্বার্থে কোন স্কুলের শিক্ষায়িত্রী পদে তাঁকে নিযুক্ত করিয়ে নিতে কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করে কার্যসিদ্ধি করেছেন এরূপ আদর্শবাদী যে কোন মূল্যে।

মূল্যবান টেরিকটনের পোশাকে শোভিত মোটর বাইক আরোহী অনেক যুবকই আজ দেশের সেবায় কর্মক্লান্ত। দেখে মনে হয় বেঁচে আছে ওরা। বাঁচবেই তো। ওরা যে নন্দলাল। ভাই কলেরায় মরে মরুক। ওরা মারা গেলে দেশের হইবে কি? শুভঙ্কর নিয়োগীর মত দুঃস্থ লোকের দিকে তাকাবার ফুরসত ওদের কোথায়?

সন্ধ্যা সবে উত্তীর্ণ। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে রমা দেবী ভাবছেন

স্বামীর কথা। এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তাঁকে দেখেনি কখনও কেউ। সদানন্দ প্রকৃতির মানুষ। ভাবনায় ভেঙে পড়েছেন। সে হাসি কোথায় মিলিয়ে গেছে। বড় দুঃখ হয় সরমা দেবীর।

সোমনাথ পা পা করে মায়ের কাছে এসে বসলো। মায়ের পিঠে হাত রেখে বললো—আর কত ভাববে মা? আমি ভগবানের কাছে গিয়েছিলাম, তিনি বলে পাঠালেন তুমি যেন আর একটুও না ভাব। মুখে হাসি টেনে এনে মা বলেন—কী বকছিস পাগলের মতো।

না, পাগলের মতো কিছু বলছে না সোমনাথ। চাকরি একটা পেয়েছে সে। ভগ্নিপতি যোগাযোগ করে করে দিয়েছে, সরকারি কোন চাকরি নয়, সওদাগরি অফিসে। সেটাও খুব বড় নয়। ছোটখাটো। কাকেও কিছু বলেনি। কয়েকদিন হলো যাচ্ছে সে অফিসে। কাজ বুঝে নিতে হয়েছে। মালিক খুশি। প্রারম্ভিক মাইনে একটা ধার্য হয়েছে, পরে বাড়বে। নিয়োগপত্র দিয়ে দিয়েছে আজ।

সরমা দেবীর মধ্যে কোন উল্লাস বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল না। ছেলের চিবুক স্পর্শ করে সস্নেহ চুম্বনে একটা আশীর্বাদ জানালেন শুধু। ধীর পদক্ষেপে গৃহ-সংলগ্ন শ্রীধরনাথের মন্দিরে গিয়ে গলায় আঁচলটা ঘুরিয়ে দিয়ে প্রণতি নিবেদন করলেন বাস্তু দেবতার উদ্দেশে।

শুভঙ্করবাবু কিন্তু এ আনন্দ চেপে রাখতে পারেন না। রাতটা কোন রকমে কাটলো। সকাল না হতেই রাস্তায়। ভগবানের মুখ তুলে চাওয়ার এ সংবাদটা ফলাও করে জাহির করতে থাকেন লোক ধরে ধরে। ছেলে যে তার হীরের টুকরো, লেখাপড়া শেখার মতো শিখেছে। বিদ্যের ধার আছে। এরা কি বসে থাকে? একটু সুযোগের অপেক্ষা—এসকল অহংকারের কথায় গদগদ হয়ে আস্ফালনে ফেটে পড়তে থাকেন যেন। বিহ্বলতায় বেসামাল হয়ে পড়েন কখনও।

সরমা দেবী বিব্রত ও লজ্জিত। কি এমন হয়েছে যে এত ঢাকঢোল পেটাতে হবে। মেয়ে সুকন্যা একপ্রকার ধরে বেঁধে ঘরে নিয়ে যায়

বাবাকে। বকে দেয়। বলে—থাম তো লোকে বলবে কী? ভগবান যেন স্পেশাল করুণা পাঠিয়েছেন তোমার জন্যে।

আত্মতৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ে শুভঙ্করবাবুর সারামুখে।

মধু বক্সীর কানে গেছে কথাটা—সোমুর চাকরি হয়েছে। এক ছুটির দিনে সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে রাস্তার মোড়ে একটা নিরিবিলি জায়গায় একটু চেষ্টা করেই দেখা করে নিয়েছে সোমনাথের সঙ্গে। আশীর্বাদ করেছে।

সোমনাথ সংকুচিত হয়ে বলেছে—মাস দুই যাক। তারপর কিছু কিছু করে আপনার টাকাটা দিয়ে দোব।

মধু বক্সী বাধা দিয়ে বলেছে—না না টাকা ফেরতের প্রশ্ন নেই। নিজের ছেলে তো বে-থা করে হারিয়ে গেল কোথায়। বড় করে একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন—ভেবেছিলাম মা-মরা ছেলেটাকে নিজে দেখেশুনে সংসারী করে গুছিয়ে দোব। তা আর হোল কোথায়! তুমি আমার ছেলের মতো। তোমার উন্নতি হোক এটাই চেয়েছি আমি। সুদে আমি টাকা খাটাই ঠিকই। তবে-তোমার কাছ থেকে সুদ আসল আদায় করব অন্যভাবে।

একটু হাসলেন হালকা করে।

হাসিটা বিশেষ অর্থবহ মনে হল সোমনাথের। সমুখের পথটায় অন্ধকার নেমে এল। মনে পড়লো মধু বক্সীর রক্ষিতা কন্যা মহুয়ার কথা।

শুভঙ্করবাবুর সংসারে তাঁর স্ত্রী সরমা দেবীই সব।

খুব সত্যি কথা যেটা সেটা হলো অর্থ-বিত্ত সম্পদে মোহান্ধ নয় শুভঙ্করবাবু। সংসার পরিচালনার দক্ষতাটাও তাঁর আয়ত্তে নেই সে প্রমাণ ভুরি ভুরি। তবে সুখস্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকেন, কোন বাধার ধার ধারেন না ভদ্রলোক।

কয়েকটা মাস হয়ে গেল সোমুর চাকরি হয়েছে। মাস পয়লায় মাইনে পেয়ে মায়ের হাতেই দেয় এনে। বাবা এসবের মধ্যে নেই। মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা কম দেয় সোমু। মা কিছু বলেন না। ছেলে রোজগার

করছে। বন্ধুবান্ধব আছে, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে মিশতে হয়। খরচ আছে। স্বভাব-চরিত্তির তো খারাপ নয়। চিন্তার কি আছে?

কিন্তু আজকাল ছুটির দিনে বাড়ি থাকে না। কখনও কখনও রাত করে বাড়ি ফেরে। মায়ের মনে কেমন যেন খোঁটকা লাগে। বয়েসটা তো ভাল নয়! কোন মেয়ের পাল্লায় না পড়ে যায়!

পড়েছে সে অনেক আগেই। কলেজে পড়তে পড়তে। এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে চেয়েছে। কিন্তু কিভাবে বোধহয় কোন অসতর্ক মুহূর্তে একটা ফাঁদে পা গলিয়ে ফেলেছে সোমনাথ।

শান্তা মল্লিক রূপসী ছিল একথা বলা যায় না। চেহারায় চটক ছিল। স্বভাবটাও ছিল চটুল। অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গেই তার মেশামেশি ছিল। তবে কারও পয়সায় এককাপ চাও খায়নি সে কোনদিন। চা-কফি, চপ-কাটলেট দরাজ হাতে খরচ করে খাইয়েছে সে সকলকে। নিজেকে মাঝে মাঝে একটু আলাদা করে নিত। লেখাপাড়ায় একটা কৌলিন্য ছিল। বাবার আর্থিক স্বাচ্ছল্য এবং স্টেটাশ এসবগুলোর সুবাদেই বোধহয় তার এই স্বাতন্ত্র্য।

সোমানাথকে শান্তার ভাল লেগে যায়। আস্তে আস্তে কাছে আসতে থাকে। সরাসরি বিয়ের প্রস্তাবও সে করে বসে একদিন। সোমনাথ জানায় তার অক্ষমতা। সে তখন বেকার।

সোমনাথ চাকরি পেয়েছে। শান্তা-সোমানাথের ঘনিষ্ঠ হওয়ার বাধাটাও যেন অনেকখানি অপসারিত হয়েছে। সোমনাথ সানন্দে শান্তাকে জানিয়েছে তার চাকরি পাওয়ার খবরটা, শান্তা অভিনন্দন জানাতে এসেছে বোটানিক্যালের একটা নির্দিষ্ট জায়গায়। শান্তা সব ব্যাপারেই একটু ডাকাবুকো। এই ভালবাসাবাসির ব্যাপারেও। সে পূর্বাহ্ণেই অকপটে জানিয়েছে—তারা খ্রীস্টান। বাবা মদ খান। মা খুব আপ-টু-ডেট না হলেও একেবারে সেকেলে নয়। আগে মদ খেতেন, ড্যান্স করতেন, এখন

অবশ্য ওসব ছেড়ে দিয়েছেন। বাঙালী হিন্দু মহিলার পোশাক-আশাকের প্রতি কিন্তু তার লোভ খুব। বলেন, চেহারাটাকে সুশ্রী এবং লাবণ্যময়ী করে তুলতে এ পোশাকের নাকি জুড়ি নেই।

এ সকল কথা শান্তা আজ আবার শোনাল সোমনাথকে। সোমনাথ বললো—আগেই তো বলেছ এ সব, আবার কেন?

—একটু ঝালিয়ে নাও। ভুলে গেলেও যেতে পারো। আর তো পিছোবার পথ নাই মিস্টার। তোমাদের ফ্যামিলির কথা আমি সব জানি। বলব? বলব? ......বলে চলে—

শোন—তোমার বাবা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। মা সাধ্বী, পতিপ্রাণা, ভাই-বোনেরা এবং তুমি নিজে-হিন্দুত্বের আদর্শে মানুষ আর বাবা-মায়ের অনুগত এবং অনুসারী। দুটি পরিবারের জীবনযাত্রা পদ্ধতি, ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত—কোন দিনই মিলবে না।

—তবে—তাহলে—। সোমনাথ কিছু বলতে গেল।

তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে শান্তা বলে—তবে, তাহলে শান্তা সোমনাথকে স্বামী হিসেবে পেতে চাইছে কেন? এই তো? পেতে চাইছে এই জন্যে যে, সে তার অঙ্গসৌষ্ঠবে আকৃষ্ট, অর্থোপার্জনে তার দক্ষতা। বিয়ে করে বৌকে খাওয়াতে পারবে। সর্বোপরি তার চারিত্র্য সংযমে তার আস্থা। অবশ্য শান্তা এটাও স্বীকার করে—সোমনাথ সদ্‌বংশজাত এবং সাধু পরিবেশে মানুষ বলেই তার এই প্রত্যয়।

......বক্তৃতার ঝড় বইয়ে যাচ্ছে শান্তা আর সোমনাথের দম বন্ধ হয়ে আসছে। পকেট থেকে দুটো টফি বের করে নিজে একটা খেল, একটা দিল শান্তাকে। বললো—নাও গলা ভেজাও। বলো তো ঠিক করে বিয়েটা কি সত্যিই হচ্ছে আমাদের?

—এ কথার অর্থ? ধমকে ওঠে শান্তা। শান্তা যে সোমনাথকে কব্জা করেছে এ কথা তো ঠিক?

—হ্যাঁ তা ঠিক। সোমনাথের বেমালুম স্বীকৃতি।

—সোমনাথও তাকে পেতে আগ্রহী ভেবেই সে ভালবাসতে দিয়েছে তাকে। ভালবাসার অভিনয় করতে নিশ্চয় নয়।

শান্তা এতগুলো স্পষ্ট কথা বলতে পেরেছে বলেই যেন সোমনাথ তার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শান্তার দিকে বেশ কিছুক্ষণ। বলিষ্ঠ চিন্তাগুলো শান্তার মুখমণ্ডলে ভেসে উঠে চিক্ চিক্ করছে।

সোমনাথ আর একটু বসতে চেয়েছিল।

শান্তা উঠলো। ব্যস্ততা দেখিয়ে বললো—আজ শনিবার। বাবা সকাল সকাল ফেরেন। মার শরীর ভাল নেই। আমার বাড়িতে থাকা দরকার।

শান্তার বাবার প্রসঙ্গে কিছু একটা অনুমান করলো বোধহয় সোমনাথ। তিনি তো পানাসক্ত।

পোদড়া পর্যন্ত দূরত্বটা খুব কম নয়। রিক্সায় উঠলো দুজনেই। বলার মতো কথা তখন কিছু ছিল না যেন। তবু অকারণ কথার জন্য কথা কিছু হলো উভয়ের মধ্যে।

ওদের বাড়ির কাছাকাছি এসেই নেমে গেল সোমনাথ। শান্তা একাই ঢুকলো বাড়ির মধ্যে রিক্সা নিয়ে।

[*একটানা এত বড় বড় ঘটনা শোনার ধৈর্য থাকে না অনাদিবাবুর। নিবারণবাবু কিছু কিছু অংশ নিজে পড়ে সারাংশটুকু বলে দেন প্রায়ই। শান্তা-সোমনাথের ঘটনাটা পুরোটাই শুনেছেন অনাদিবাবু। বললেন—কী মেয়ে রে বাবা! এই মেয়েই বোধহয় বিয়ে করে এনে ঘরে তুলবে পুরুষটাকে। নিবারণবাবু বলেন—তাই তো। পুরুষদের পৌরুষ হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিচ্ছে তো এই মেয়েরা। পুরুষটাকে বাজিয়ে নিক না। এ তো ভাল কথা। পুরো পরিস্থিতিটার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে তো। দেখা যাক্ ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।*]

শান্তা বাড়ি ফিরল। ড্রেস পাল্টে টয়লেট থেকে ফ্রেস হয়ে এসে বাবা-মার সঙ্গে এক টেবিলে বসে চা খেল। সে কোথায় গিয়েছিল, এত দেরি কেন এ সব কথা উঠলো না। মামুলি-কথা দু-চারটে যা। তাছাড়া কথাবার্তা বিশেষ কিছু থাকে না এ বাড়িতে কারো মুখে। বাবা উঠে গেলেন তাঁর নিজের ঘরে বোধহয় পানের তাগিদে। শান্তা ঘরে থাকলে তিনি অবশ্য একটু সংযতই থাকেন।

মাকে যে সাজ-পোশাকে দেখতে শান্তা খুব পছন্দ করে সেই লাল পেড়ে গরদের শাড়ী আর কাপালে সিঁথিতে সিদুঁরের ছোঁয়ায় আজও মনোরমা হয়ে উঠেছেন তিনি।

শান্তা জানতে চায় আজ কোন্ ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলে? উত্তরে তিনি বললেন, ঐ মোড়ের কালী বাড়ীতে পুজো দিয়ে এলেন আজ। এবং এও বললেন—কাল রবিবার, চার্চেও যাবেন।

শান্তা একটু ঠাট্টা করে বলে—মায়ের আমার সর্বধর্ম-সমন্বয়। মাকে জড়িয়ে ধবে আদর করলো একটু। নিজের ঘরে গিয়ে সে আলমারি থেকে 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' বইখানা নিয়ে মনোনিবেশ করলো পূর্বরাগ পর্বে।

ওদিকে সোমনাথের বাড়ি ফিরতে রাত্রি হয়েছে। বকা খেল সে মা-বাবার কাছে। রাগ হয়। কিছু বলে না। সহ্য করে নেয়। সত্যিই তো দুশ্চিন্তা হবারই কথা। সাড়ে নটা বেজে গেছে। নানারকম দুর্ঘটনার কথা তো বাবা-মার মনে আসতেই পারে। তবে মা যখন বললো মধু বক্সীর কথা, বসে বসে চলে গেছে, মেজাজটা বিগড়ে গেল তার। বললো—কেন এসেছিল সে?

বাবা বললেন—মধু বক্সী আবার কেন আসে? টাকা পাবে নিশ্চয়ই। এসব লোকের ব্যাপার তো আগে চুকিয়ে দিবি? আমাকে তো কোন কথাই জানাবি না।

—থাম তো তুমি, তোমাকে ওসব জানতে হবে না। আমি কালই

দেখা করব'খন তার সঙ্গে। সোমু বাবাকে থামিয়ে দেয়।

পরের দিন সকালে সোমনাথ এল মধু বক্সীর কাছে। মধুবাবু বাইর বাড়িতে ছিলেন। সেখানেই যেতে হলো। এ বাড়িতে বড় একটা কেউ আসে না। বিরক্ত হন তিনি। তবে সোমনাথকে দেখে খুশিই হলেন। আদর করে ডেকে নিয়ে বসালেন উঠোনে পাতা চেয়ারে। নিজেও বসলেন। সোমনাথ সবিনয়ে বললো—জ্যাঠামশায়, কালকে আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন শুনলাম। মাইনে পাই, এ-মাস থেকেই কিছু কিছু করে শোধ করে দোব টাকাটা।

—আরে না না, সেজন্য যাইনি আমি। আর টাকার কথা তো ওঠেনি। অবশ্য কেন গিয়েছি কেউ জানতে চাইলে ঐ ছুতোরই আশ্রয় নিতে হতো আমাকে। আসল কথাটা আজ আমি তোমায় বলবো। বসো।

ভেতর থেকে মাঝ-বয়সী এক মহিলা প্লেটে করে কয়েকটা মিষ্টি আর একগ্লাস জল নিয়ে এসে সোমনাথের সামনের টেবিলে রেখে বললেন—খেয়ে নাও বাবা।

সোমনাথ না বলতে পারলো না। কোন কথাই সরলো না তার মুখে। অদ্ভুত একটা মায়াবী ব্যক্তিত্ব ভদ্রমহিলার। মিষ্টিগুলো খেয়ে ফেললো সোমনাথ। বলা যায় খেতে হলো তাকে।

পরক্ষণে এক অল্প বয়সী তরুণী এসে সোমনাথ আর মধুবাবুকে দু কাপ চা দিয়ে গেল। পোশাকে বাঙালীয়ানা—সুরুচির কৌলিন্য আছে। মনে হলো শেখানো কায়দায় একটা ফরমাস তামিল করে গেল সে।

হালকা চালে হাসতে হাসতে শুরু করলেন মধুবাবু—মেয়েটিকে চেন সোমনাথ?

—হ্যাঁ, আপনার মেয়ে তো, মহুয়া। স্কুলে যেতো, দেখেছি।

—এখন কলেজে পড়ে। ক'দিনে চর্‌চর্‌ করে বেড়ে গেল মেয়েটা। নিজের আর মেয়ে কোথায়? ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা রে বাবা। পালিতা

কন্যা। সবই মায়ার খেলা। বুঝলে? শুনে থাকবে হয়তো কিছু কিছু। ও মেয়ে তো তখন ওর মায়ের গর্ভে । ওর বাবা সনাতন মির্ধা। দেনার দায়ে পাওনাদারের তাগাদায় তো অতিষ্ঠ হয়ে ফেরার। আমারও তো অনেক টাকা—কিছুতেই আদায় হয় না। বার বার তাগাদায় যেতে হয়েছে ওদের বাড়ি। কোনদিন দেখা পেতাম। কোনদিন না। ......সে এক জল-ঝড়ের রাত্রি। কী দুর্যোগ। কি করি? আটকে যেতে হলো ওদের বাড়িতে। অনেকটা পথ—প্রায় চার-পাঁচ মাইল। আসা গেল না। মাঝরাতে সনাতন ফিরলো। ঘরে আমাকে দেখেই মাথায় খুন চেপে গেল যেন! বেরিয়ে গেল তীব্র বেগে। আমাকে কোন কথা বলতে দিল না। ফিরল সণ্ডা গোণ্ডা কয়েকটা লোক সঙ্গে করে। মারধোর দিয়ে আমায় ঘর থেকে বের করে দিল। টাকা তো দিলই না। দিল বদনাম। চরিত্র কলঙ্ক। ...... ছেলেটা আমার টিকতে পারলো না গ্রামে। সনাতনকেও সেই থেকে আর পাওয়া যায়নি—বেপাত্তা।

তুমি তো জান, সুদ নিয়েছি আমি ঠিকই। কিন্তু কত লোকের কত আপদ-বিপদ ঠেকিয়েছি আমি! প্রতিদানে কি পেলাম? শক্রতা, মর্মান্তিক আচরণ। অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালো আমাকে। সবাই মিলে জোটপাট করে সনাতনের স্ত্রী আর ঐ কন্যার জীবনের সমূহ দায়-দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল।

পাকচক্র, বুঝলে পাকচক্র। আমি পুরুষ মানুষ। বাজে কথায় কর্ণপাত না করলাম। কিন্তু ঐ মহিলা? সনাতনের স্ত্রী? সে দাঁড়ায় কোথায়? তাকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচাতে আমি সে দায় গ্রহণ করেছি। বিশ্বাস করবে কি না জানি না, কোন পাপ মনে ঠাঁই পায়নি কোনদিন।

সোমনাথ আর স্থির থাকতে পারে না। বলে ওঠে—আপনি থামুন জ্যাঠামশায়। ও-সব আমাকে বলছেন কেন আপনি? আমি চলি।

মধুবাবু অনুনয়ের সুরে বলেন—আর একটু বসো বাবা! কথাগুলো বলতে পারলে মনটা হালকা হয়। আর তোমার মতো ছেলেকেই

কথাগুলো আমাকে বলতে হবে। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ আমি পাইনি। আমি যে নির্দোষ এ কথা বলার মত একজন লোকও আমি পাইনি। একটা কুশীদজীবীর জীবনের ট্রাজেডীটা একটু সহানুভূতির সঙ্গে দেখা যায় কি না দেখো বাবা।

মধুবাবুকে থামাতে পারে না সোমনাথ কোন মতেই। আরও দু কাপ চা এল। এবার মেয়েটি নয়। মেয়ের মা-ই পরিবেশন করে গেল চা-টা।

মধুবাবু ভারিক্কি চালে শুরু করলেন—ভাবছ এত কথা তোমাকে বলা কেন, এই তো? শোন, সোজা কথা একটা বলি। ভণিতা বা ভূমিকা না করেই যা বলার আমি তা সোজাসুজি বলে থাকি। ঐ যে মেয়েটি, মহুয়া মির্ধা ওর নাম। ঐ মেয়েটিকে তোমার হাতে দিতে চাই আমি।

মধুবাবু থমকে যান একটু।

বাধা দেয় সোমনাথ—এসব কথা আমাকে কেন বলছেন? মা-বাবা আছেন—

গলার স্বর নরম রেখেই বলেন মধুবাবু—আমি এসব বুঝি বাবা। বাপ-মায়ের আজকাল আর সে দাপট কোথায়? যতদিন বাপের হোটেলে থাকতে হয় ততদিনই যা বাপ-মায়ের এক্তিয়ারটা একটু মান্যি করে চলে ছেলেরা। তারপর যা হোক একটা চাকরি পেলেই হলো, অমনি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এসে যায়। অন্তত বিয়ের ক্ষেত্রে। আবার যদি সে মিলনটা অসবর্ণ হয় তাহলে তো তা অ্যারিস্ট্রোক্র্যাট হলো। যুগোপযোগী হলো। তবে বাপ-মায়ের প্রতি যে ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে না তা নয়। ট্যাক্স হিসাবে কিছু টাকা বাপ-মাকে তারা দিতে চায় এবং দেয়। মধুবাবু একটু থামেন। কথাগুলো আউট লাইনে চলে যাচ্ছে না তো!

একটু ভেবে শুরু করলেন আবার—যাক ও সকল কথা। আমার প্রস্তাবটা শোন। আমি ধরে নিয়েছি মেয়ে তোমার অপছন্দ হবে না। শিক্ষায়-দীক্ষায় তোমার পাশে দাঁড়াতে পারবে। আর যৌতুক তোমাদের চাওয়ার থেকে বেশি বই কম হবে না। ১৬ ভরি সোনার গয়না আর

কুড়ি হাজার টাকা নগদ দোব। ৭ বিঘা জমি মহুয়াকে দেওয়া আছে আমার। ওটা পাবে। তারপর অন্যান্য আসবাবপত্র উচ্চমানেরই দেওয়া হবে সব। চাইলে মোটর বাইকও একটা দোব। বাধা যেটা, সেটা হলো জাত-পাতের। ও-সব নিশ্চয়ই তোমরা আজকাল মানছো না। তোমার নিজের মাতুল শ্রীমান রতন, সে তো বহাল তবিয়তে পাশের গাঁয়েই বাস করছে। নিম্ন বর্ণের মেয়ে হোক, দেখতে ভাল না হোক, আর স্বামী পরিত্যক্তাই হোক, এরকম কাউকে বিয়ে করাটা বড় মাপের সমাজকল্যাণ। ততখানি বাহবা পেয়েছে কি না সে একাজ করে তা জানি না, তবে একটা হিল্লে তো তার হয়েছে, ঘরজামাই আর ক্রীতদাস যাই বলুক লোকে, খেয়ে পরে বেঁচে তো আছে।

সোমনাথ উঠে দাঁড়ায়। বলে—আমি চলি জ্যাঠামশায়। টাকাটা আপনার যত তাড়িতাড়ি সম্ভব শোধ করে দিয়ে যাবো। চলি

মধু বক্সী বলে—ঠিক আছে। তাই দিও। আমার অনুগ্রহ তোমাকে নিতে বলছি না। তবে আমার প্রস্তাবটা একবার ভেবে দেখো। আর ঐ ধর্ম কথাটাকে মান্যি দিও—মেয়েটির পদবী মির্ধা, বক্সি নয়।

ফিরে যাওয়ার কালে অদূরে সোমনাথের চোখে পড়লো রান্নাশালের দাওয়ায় খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন মহুয়ার মা—মুখটা কালো হয়ে গেছে।

শুভঙ্করবাবুর বাড়ির অদূরেই মহিলাদের জন্য 'সিবন শিক্ষণ শিবির' নামে একটা আধা সরকারী সংস্থা ছিল। তাঁর এক বন্ধুকন্যা ছিলেন ওখানকার শিক্ষিকা। তাঁরই ঐকান্তিক সহযোগিতায় সুকন্যা ওখানে ভর্তি হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই বেশ পারদর্শী হয়ে ওঠে ঐ শিল্পে। সরকারী ব্যবস্থায় স্বল্প কিস্তিতে দেয় মূল্যে একটা সেলাই মেসিন এনে দিয়েছেন তার জন্যে ঐ দিদিমণি। বাড়িতে বসেও অনেক কাজ করে। এবার একটা উলবোনা মেসিনও পাবে সে একটা বিশেষ ব্যবস্থায়। সবকিছুই হচ্ছে বাবার ঐ বন্ধুকন্যার হেপাজতে। উপদেষ্টা, গ্যারেন্টার, এমন কি

অভিভাবিকার ভূমিকাতেও দাঁড়াতে হচ্ছে ভদ্রমহিলাকে।

বয়েসের মেয়ে বাইরে বেরুচ্ছে। ভয় হয় বাবার। পাছে কোন অঘটন ঘটে যায়। মায়েরও দুশ্চিন্তা। তথাপি ভাবছেন তাঁরা কাজকর্মের মধ্যে থাকলে মনটা ভাল থাকবে মেয়ের। হতাশায় পেয়ে বসবে না। সর্বোপরি তাঁদের সিদ্ধান্ত—বিয়ে যদি নাই হয়ে ওঠে তবে অন্তত ভাইয়েদের গলগ্রহ হতে হবে না।

সুকন্যার কথা সবই বলেছে সোমনাথ শান্তাকে। এতে শান্তার পূর্ণ সমর্থন। সুযোগ থাকলে সেও সাধ্যমত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত তার দিকে। তবে একটা কথা বলতে সে ছাড়েনি—দেহ-মনের ছন্দোবদ্ধতাই জীবনের সার্থকতা এনে দেয়। তাই দেহটার সুরক্ষাই শুধু নয়, মনটার কথাও তো ভাবতে হবে। অবশ্য কে কার কথা ভাবে? যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত।

বড় একটা ঠোক্কর খেয়েছে সোমনাথ।

আর একদিন। বড় কাছাকাছি এসে গেছে সোমনাথ আর শান্তা। আজও পূর্বনির্ধারিত সময়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনের নির্দিষ্ট জায়গাটায় এসে বসেছে তারা। আজ কোন ছুটি বা হাফ-ছুটির দিন নয়। অফিস কামাই করে এসেছে সোমনাথ। এনগেজমেন্টটা সে-ই করেছে। কাজটা ঠিক করেনি বলে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিল শান্তা।

সোমনাথ বলল—একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক্। সুরে তার বেশ ঝাঁঝ আছে বলে মনে হলো শান্তার।

শান্তা কিন্তু নরম সুরেই বলে—বেশ তো কর না হেস্তনেস্ত। বিয়েটা সেরে ফেলতে চাও তো?

—হ্যাঁ, তাই। এভাবে বছরের পর বছর অপেক্ষা করে বসে থাকা—ধৈর্যে কুলোচ্ছে না আমার। শেষ দিকটায় কথার স্বরটা কেমন ভাঙা ভাঙা হয়ে যায়।

কষ্টটা যে শুধু সোমনাথের নয়, শান্তারও—তবে সযত্নে সে তা আড়াল করে রাখে বুকের মাঝে সম্ভ্রমের একটা হালকা আবরণে।

সোমনাথের হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সমবেদনার পরশ দিতে থাকে সে। মিষ্টি হাসি মিশিয়ে বলতে থাকে—ধীরে সখা ধীরে। সবুরেই তো মেওয়া ফলবে। তোমার ক্ষেত্রেই বলো আর আমার পক্ষেই বলো অনাঘ্রাত পু্পের সুষমাটাকে লাঞ্ছনা থেকে যতটা মুক্ত রাখতে পারব তার আস্বাদনটা ততটাই তো মহিমায় ভাস্বর হয়ে সঘন চিরন্তনী হয়ে বিরাজ করবে তোমার আমার মধ্যে।

সোমনাথ অবাক্। এ সব কী বলছে শান্তা!

এ তো বাক্‌চাতুর্য নয়, চটুলতা নয়, এতো ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস-সর্বস্ব ভালবাসায় ফেটে পড়া নয়, প্রগাঢ় প্রেমের পবিত্র শিহরণ।

প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া সোমনাথকে একটা ঠেলা দিয়ে ডাকে শান্তা—কি হলো?

—না, কিছু না। আর কিছু বলবে?

—বলবো। তুমি শুনবে কি?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই শুনবো। বলো যা বলার আছে সব বলো।

—আমিও ভেবেছি আজ, পরিষ্কার করে কিছু বলার প্রয়োজন আছে আমার। বলছি, শোন।

প্রথম কথা সুকন্যার বিয়ে। দিতেই হবে। নেপথ্য সহযোগিতা চাইলে আমারও পাবে। তারপর... হ্যাঁ, তারপর তোমার বাবা-মা যাঁরা আমারও বাবা-মা হয়ে পড়ছেন ক্রমে, তাঁদের মনে আঘাত দেওয়ার মত নিকৃষ্ট কাজটা করব না আমরা কখনোই। তুমি না পার, তাঁদের সঙ্গে দেখা করে আমাদের বিয়ের কথাটা পাড়বো আমি নিজে।

সোমনাথের মুখে একটা স্বপ্নালু দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে বলে শান্তা—আমাদের বিয়েটা কিরকম হবে বলো তা। ঐ রেজিস্ট্রি অফিসের টেবিল সাক্ষী করেও নয়, কালীঘাড়িতে গিয়ে হাতে শাঁখা গলিয়ে,

কপালে সিঁথিতে সিঁদুর ছুঁইয়েও নয়। সে বিয়েতে না আছে সোয়াদ, না আছে সৌরভ। বিয়ে হবে নির্ভেজাল হিন্দু মতে, আত্মীয়-স্বজন সমভিব্যাহারে-ছাঁদনাতলায় রীতিমত শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে এয়তিরা সব সাতাশ কাঠি জ্বেলে প্রদক্ষিণ করে স্ত্রী-আচার করবে। কোনেকে পিঁড়িতে বসিয়ে সাতপাক ঘুরিয়ে এনে ঘটা করে শুভদৃষ্টি হবে। নাপিত শোলোক কাটবে। তারপর তো কন্যা সম্প্রদানাদি যথানিয়মে সবই হবে।

সোমনাথ থ' বনে যায়। বোবার মত চেয়ে থাকে। শান্তার মতো একটা আপ-টু-ডেট মেয়ের দিকে।

কিঞ্চিৎ বিরতির পর শান্তা আবার শুরু করে,

—দেখ সোমনাথ, কী মাধুর্য, কী আনন্দ এ বিয়েতে। এর মধ্যে পরিবারে পরিবারে যে মেলবন্ধন, ঘনিষ্ঠ সংযোগ, তার গাম্ভীর্য, তার ঐশ্বর্য বিবাহ বলে বস্তুটাকে মহিমান্বিত করে তোলে বলে আমার মনে ধারণা। নবদম্পতীর জীবনে সুবাতাস বইয়ে দেয় ঐ সকল মধুর মধুর অনুষ্ঠান। দেনা-পাওনা নিয়ে দু পক্ষের মধ্যে কুট-কচাল যে থাকে না তা নয়, তবে তাও অনেক সময় বেশ উপভোগ্য হয়। আজকাল খুব অশোভন ব্যাপার বড় একটা হয় না। আর তাছাড়া পণ দেওয়া-নেওয়ার বা নানান রকম যৌতুক নিয়ে বাদ্ বিতণ্ডার কোন ব্যাপারই তো নেই এসকল বিয়েতে। সোমনাথ মুখে গাম্ভীর্য টেনে এনে বলে—কল্প-লোকের গল্প কথা আর কত শুনবো?

—না না কল্পলোকে বিহার করা আমার ধাতে নেই মশায়। ঠাট্টার সুরে বলে শান্তা।

একটু বক্তৃতার কায়দায় বলতে থাকে আবার—একমাত্র আদিমতার আকর্যণে শৃঙ্খলিত বিবাহ খুবই নিকৃষ্ট। পাত্র এবং পাত্রী এই দুজনের মধ্যে সংকীর্ণ আবেষ্টনীতে যে বোঝাপড়ার বন্ধনের বিয়ে তা বড়ই মেকানিক্যাল। বারবার কি মনে হয় জান? রিপুর কবলে পড়ে বিবেক লয় পাবে কেন? একবার ভেবে দেখ তো, তুমি আর আমি

ভালোবাসবার সুযোগ পেয়েছি বলে কি পারিপার্শ্বিকতাকে উপেক্ষা করে বিয়ের চিহ্ন একটা কিছু ধারণ করে ঐ রকম একটা নির্লজ্জ বিবাহে ঝুলে পড়বো আমরা? আমার বাবা-মা হয়তো তাদের মেয়ে একটা ভাল ছেলের গলায় মালা দিয়েছে বলে একটু তৃপ্তি পেতেও পারে কিন্তু তোমার বাবা-মা-ভাই সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে আছে, কী অধিকার আছে আমাদের তাদের হেয় প্রতিপন্ন করার? কোন্ উচ্চমানের সমর্থনযোগ্য যুক্তিকে তুলে ধরবো তাদের সামনে বলতে পার? সত্যি বলছি সোমনাথ, কলেজ থেকে বেরিয়ে ঐ একপ্রকার কদর্যতার মধ্যে গিয়ে শিক্ষাকে কলুষিত করতে আমার রুচি নেই।

তাহলে কী বলতে চাইছো তুমি? খাড়াখাড়ি প্রশ্ন করে সোমনাথ।

উত্তরের ভঙ্গিতেই বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলে শান্তা—আমি বলছি বিয়ে আমি করব আমার নির্বাচিত পুরুষ যে তুমি, তোমাকেই। তবে তোমার বা আমার বাবা-মার অজ্ঞাতসারে নয়। হিন্দু মতে। গোপনে নয়, দস্তুর মতো সানাই বাজিয়ে আমাদের বিয়ে হবে। .....তোমার বাবা-মা রাজী হবে না ভাবছ তো? সে দায়িত্ব আমার। তাঁদের রাজী আমি করাবই ধর্মের বাধার কথা ভাবছ? শোন, আমরা শুধু হিন্দু নয় ব্রাহ্মণও বটে। বাবা বৈষয়িক কারণে খ্রীস্টান হয়েছেন মাত্র। ওটা বুঝিয়ে বলতে আমার কোন অসুবিধে হবে না।

হতাশ হয়ে পড়ে সোমনাথ, বৃথা চেষ্টা।

শান্তা সোমনাথের দুটো কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকানি দেয় একবার। বলে—ঘবড়ে যাচ্ছো? শুনবে আমাদের পারিবারিক ইতিহাস? থাক্ আজ অনেক বকেছি। আর একদিন বলবো।

—না, যা বলার আজই বলো। ঝুলিয়ে রেখে আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিও না দয়া করে। কিছুটা অনুরোধের সুরে বলে সোমনাথ।

শান্তা বলে চলে—বেশ শোন। ছোট করে বলছি। আমার মামার বাড়ি বিষ্ণুপুর। মা আমার ভটচায বাড়ির মেয়ে। বিষ্ণুপুরী ঘরানায়

উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতে বেশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। ওটা আমার মামাবাড়ির ট্রাডিসন। বাবা আমার ছিলেন বেশ বড় সারেঙ্গী বাদক। ভীষ্মদেবের ঘরানায় কিছু কিছু খেয়ালও গাইতেন। ঐ গান-বাজনার সূত্র ধরেই বাবা-মায়ের মধ্যে ভালবাসা দানা বেঁধে ওঠে। আমার ঠাকুর্দা ব্যাপারটা জানতে পরে ছেলের বিয়ে দিয়ে মাকে বৌ করে আনেন ঘরে। মাকে বেশিদিন শ্বশুর-শাশুড়ির আদর খেতে হয়নি। আমি তখনও হইনি, অল্প দিনের ব্যবধানে তাঁদের দেহান্ত ঘটে।

বাবা তো শর্ষেফুল দেখলেন চোখে। ইটভাটা, টালিভাটা এসব নিয়েই ছিল পৈতৃক ব্যবসা। ঐ ব্যবসার স্বার্থেই, কেন জানি না, আমাদের খ্রীস্ট ধর্ম নিতে হয়েছিল। সেই সুবাদেই নাকি মোটা অর্ডার পেয়েছিল বাবা। বড় বড় পার্টি দিতে হয়েছে, সাহেব সুবোদের মৌজ করাতে হয়েছে। মদ অবশ্য বাবা আগেই ধরেছিলেন, ওই সূত্রে মাত্রাটা বেড়ে গেল খুব। এমন কি মাকেও গান গাইতে হয়েছে—মদও খেতে হয়েছে। পয়সা হয়েছে আমাদের অনেক। কিন্তু একটা হতাশার কালো আস্তরণে ঢাকা পড়ে গেছে আমাদের সংসারটা। বাবা কথাবার্তা বলেন খুব কম। সারাক্ষণই মদে চুর হয়ে থাকেন। পথে ঘাটে মাতলামি করতে দেখিনি কখনও। তবে যেদিন সকাল সকাল বাড়ি ফেরেন বা ছুটির দিনে মাত্রা একটু চড়িয়ে ফেলেন। বোধহয়। তাতে মায়েরই অসুবিধে হয়। এমন হয় আমি যে রয়েছি ঘরে বাবার হুঁশ থাকে না। মা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। আমি অবশ্য একটু সরে সরেই থাকি তখন। তবে আমাকে সামনে দেখলে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে যায় বাবা। তাই সব সময় এড়িয়ে থাকতে পারি না।

মা তো গান-বাজনা সবই ছেড়ে দিয়েছেন। স্বামী-কন্যার মঙ্গল কামনায় চার্চেও যান, কালীমন্দিরেও যান। দু-একটা ঠুংরি-টপ্পার তান মিছরির দানার মত কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ে মায়ের। সুরের আবেশে ডুবে যান। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন বাবা মায়ের মুখের দিকে। চোখ দুটো

তার জলে ভরে টলটলিয়ে ওঠে। কতবার দেখেছি আমি বাবার সেই বাঁধ ভেঙে উপছে পড়া আবেগের ঢল।

সোমনাথের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়ে দীর্ঘশ্বাস উন্মোচিত হলো।

শান্তা হালকা হাসির ঝলকানিতে উড়িয়ে দিল সেটা। বললো—আমার আবেগটা বুঝি চলকে চলকে পড়ছে, তাই না? এখন ভাবাবেগ পরিহার করা যাক্। কাজের কথা শোন। আমি একটা ক্ষুদে সওদাগরি অফিসে চাকরি পেয়েছি।

—চাকরি! অবাক সোমনাথ।

—হ্যাঁ টাইপিস্টের চাকরি। ডেজিগনেশনটা কিন্তু পি. এ.।

—তাই নাকি?

—ঘাবড়াচ্ছ কেন? চাকরি বেশিদিন করা যাবে না। কারণ যার পি. এ. হতে হচ্ছে, তার চাউনিটা ভাল লাগেনি আমার। কি আর করা যাবে? বাবার ব্যবস্থা, মানতেই হচ্ছে। উপলক্ষ যাই হোক, লক্ষ্যটা বাবার সহজেই অনুমেয়।

সোমনাথের উঠি উঠি ভাব। বলে—ঠিক আছে, এবার ছেড়ে দাও আমায়।

—মানে! ধরে রেখেছি নাকি আমি তোমায়? হাসতে থাকে শান্তা।

—না, মানে সব তো বলা হয়ে গেছে তোমার—আর কেন? অভিমানের সুর সোমনাথের।

—বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছ? তোমার কাছ থেকে সরিয়ে নিচ্ছি নিজেকে—তাই মনে হচ্ছে? অকপটে সব কথা নির্দ্বিধায় বলে ফেলেছি আজ। আমার ইচ্ছা, আমার সাংসারিক পরিমণ্ডল কিছুই অজানা রইলো না তোমার। পতি নির্বাচনে সয়ম্বরা হয়েছে হিন্দু রাজকন্যারা। তাই পতি নির্বাচনেও আমার ভূমিকা নিশ্চয়ই নিন্দনীয় নয়। অন্য কোন অধীশ্বরকে আমার মনোরাজ্যে অভিষিক্ত করার পাপ আমাকে কোনদিনই স্পর্শ করতে পারবে না এটা জেনে রেখো। অনুগ্রহ করে আমার ওপর আস্থা

রাখ। তবে আমার বঁধুয়া যদি আন বাড়ি যায়, বাধা দেব মা আমি, অনুরোধ করব শুধু আমার আঙিনা দিয়া যেন না যায়। একটা কৌতুকের হাসি হাসতে গিয়ে চোখের কোণে জল দেখা দিল শান্তার।

আজকেব মত সভা ভঙ্গ হলো দুজনার।

[ক্রমশঃ]

[*নিবারণবাবু শান্তার কথাগুলোর আস্বাদ বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাবছিলেন মেয়েগুলো সব যদি শান্তার ধাতে গড়া হতো! অনাদিবাবু যথারীতি চা জুগিয়ে দিয়ে ঘটনার সারমর্মটা জেনে নিলেন নিবারণবাবুর কাছ থেকে; মন্তব্য করলেন : বেটা ছেলে, লেখাপড়া শিখেছিস, চাকরি করছিস—লজ্জা করে না বেহায়ার মতো এভাবে মেয়েছেলের পিছনে ছোঁক ছোঁক করে ঘুরে বেড়াতে! বেশ হয়েছে, চাবকে সিধে করে দিক মেয়েরা। বাপ-মা আছে, ঘর-সংসার আছে, আব্রু-ইজ্জত আছে, বংশমর্যদা আছে—দেখে শুনে সম্বন্ধ করে বিয়ে হোক না রে বাবা! বয়েসের কালে বিয়ে করবে, দোষের কি?*

নিবারণবাবু জ্ঞানীর মেজাজে বলেন—ওসব তুমি বুঝবে না অনাদি। কখন কে যে কী ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে! চরিত্রের দৃঢ়তাই মানুষের জীবনকে বলিষ্ঠ করে তোলে—শৈথিল্যে তার ঠিক উল্টো। সুলভে জীবন উপভোগের উপকরণ হাতিয়ে নিতে বা লুঠ করে নিতে যারা ব্যগ্র তারা শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত—কি ব্যক্তিগত মানবজীবনে কি সমষ্টিগত সমাজজীবনে। এরা নিজেকে ক্ষীণজীবী করে তোলে, সমাজদেহে নেমে আসে পক্ষাঘাত। পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমাদের সমাজের কাঠামোটা বিন্যস্ত করতে গিয়ে সংস্কারের ক্ষেত্রে সংঘাত দেখা দিচ্ছে অহরহ। ফলে সমাজদেহটা যে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, পচে গলে খসে খসে পড়ছে, তারই যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদটা চৌচির হয়ে ফেটে পড়ছে বিব্রতবাবুর লেখায়। অনাদি অতশত বোঝে না। ঘটনাটার পরিণতির দিকেই তার আগ্রহ। বিবর্তন-এর পরের ইস্যু বেরুলো পরের শনিবার। আজ অনাদিই গাঁটের পয়সায় কিনে আনলো সেটা। নিবারণবাবু কাগজ নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। হাতে মানসীর দেওয়া চায়ের গ্লাস। বসার জায়গাটা আজ মানসীর দোকানের সামনের বেঞ্চটা।

মানসী এলাউ করেছে। বিষয়টাকে কেন্দ্র করে ভীড় জমে যায়। চাও কিছু বেশি বিক্রি হয় তাই।]

বিবাহের উত্তর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাই তো! তিনদিন হয়ে গেল, ছেলেটার কোন হদিস নেই। ছেলেটা আর কেউ নয় সোমনাথের ছোটভাই নীলকান্ত। কিছুদিন পড়াশোনায় মন নেই দেখা গেছে। কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষা। তাই আড্ডা-ওড্ডা দিয়ে ঘুরেছে গুরুত্ব ততটা নেই ভেবে। ভাল ছেলে। ওর কাছে ঐ পরীক্ষাটা এমন কিছু নয় এই ভেবে সুকন্যা কি সোমনাথ কোন খবরদারি করেনি। বাবা-মা তো অতশত বোঝে না। ভাবেওনি কিছু। এখন দুর্ভাবনা—কোন দুর্ঘটনা কি না।

সুকন্যা কাজে বেরিয়ে গেল সকালেই। চাকরিতে পদোন্নতি হয়েছে তার। সকাল সকাল যেতে হয়। তারই কাছে থাকে কেন্দ্রের চাবি, খুলতে হয় তাকেই। পথে যেতে যেতে সুকন্যা ভাবে দু'শ টাকা নীলু চাপাচাপি করে তার কাছ থেকে নিল কেন? কোন্ প্রয়োজনে? জিজ্ঞাসা সে কিছু করেনি। ভেবেছে বইপত্র কিছু কিনবে বোধ হয়। কোথাও ফিস্ট টিস্ট করতে যেতেও পারে। বাড়িতে বলতে পারেনি। গোপনে বলেছে তাকে।

সোমনাথও বেরিয়ে গেল। কলেজে খোঁজ নিয়েছে। পরীক্ষা দেয়নি সে। না, কোন দুর্ঘটনার খবরও কানে আসেনি। মনটাকে শক্ত করে নিয়েছে সে। ভাবছে নীলকান্ত হারিয়ে গেছে ঠিকই, তবে তার প্রত্যয় এ হারানোটা স্ব-ইচ্ছায়। ফিরেই আসবে। খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না।

শুভঙ্করবাবু ভোর রাত্রেই বেরিয়ে গেছেন রাস্তায়। ইস্টিশানের দিকে। যদি কোন খবর পান। ছেলেটার নিরুদ্দেশের কারণ কিছু মাথায় আসছে না। কোন বাজে লোকের প্রলোভনে পড়ে গেল! লোকটাকে কেউ কোন সান্ত্বনা দিতেও ভরসা পায় না। আনুমানিক কতকগুলো আশঙ্কায়

বুকটা গুরগুর করে কেঁপে উঠতে থাকে তাঁর। হতাশায় ন্যুব্জ হয়ে তিনি ফিরে আসেন ঘরে। দেখলেন শ্যালক রতন এসেছে। সরমা দেবীর পরণে পাটের শাড়ি। ঠাকুর ঘরে ছিলেন মনে হয়। এসে দাঁড়িয়েছেন ভাইয়ের কাছে।

রতনের মুখমণ্ডলে গাম্ভীর্যের পলেস্তারা। দিদি আর ভাগনীপতি উভয়ের উদ্দেশেই বললো—ভেঙে পড়ার কোন কারণ নেই। নীলু ভাল আছে।

শুভঙ্করবাবু ব্যগ্র হয়ে জানতে চায়—কোথায় সে?

টাটানগরে সাঁকচিবাজারে মধু বক্সীর এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে উঠেছে। সাবলীল উত্তর রতনের।

শুভঙ্করবাবু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেন—তার মানে? সেখানে কি?

—একটা কাজের ব্যাপারে।

—কাজ! মানে লেখাপড়া আর করবে না?

—লেখাপড়া করেই আর কি হবে? বি. এ. পাশ করেও তো চাকরি-বাকরির আশা নেই। তার থেকে ভাল ব্যবস্থাই হয়েছে। অত সম্পত্তি, টাকাপয়সা, সোনাদানা, অভাব বলে তো আর কিছু থাকছে না? মধু বক্সীর ঐ আত্মীয় একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর মালিক। সেখানেই চাকরি একটা আপাতত করবে।

সরমার গলা শুকিয়ে যায়। শুকনো গলাতেই বলে—মানে কি বলছিস তুই? খুলে বল।

গলার স্বর একটু নিচু করে বলে রতন—ঐ যে মহুয়া, মধু বক্সীর মেয়েই বলি, ওকে নিয়ে গেছে, বিয়ে করবে।

শুভঙ্করবাবু গর্জে ওঠেন—তুমি এসব খবর পেলে কোথা থেকে? নিজেই বুঝি ভাগ্নার বিয়ের ঘটকালিটা করেছ?

নির্বিকার রতন বলে চলে—না, তা নয়। ঐ মহুয়ার সঙ্গে আমার বৌ-এর বেশ ভাবসাব। ওকে বলেছে মেয়েটা। আগে জানলে বাধা

দিতাম নিশ্চয়ই। পরে করতে বলতাম। বিয়ের যুগ্যি বোন রইলো ঘরে, বড়দাদা এখনো বিয়ে করেনি। এ কখনও হয়? যাক্ সে যা হবার হয়েছে। মাথা খারাপ করে লাভ নেই। আজকাল এসব হচ্ছে একচার, ঘরঘর। কিছু বলার নেই। একেবারে হা-ঘরের ঘরে কিছু একটা করে বসেনি তাই ভাল। মেয়েটার এখন বিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর তাড়াতাড়ি। ব্যস্। আমি চলি এখন।

চটি জোড়াটা পায়ে গলিয়ে দ্রুত চলে গেল রতন।

শুভঙ্করবাবু বোবা। সরমা দেবী ঢক্ ঢক্ করে এক ঘটি জল খেল।

এ সব খবর ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে না। মুখে মুখে রঙীন হয়ে, মুখরোচক হয়ে বর্ণনা-ব্যঞ্জনায় মুখরিত হতে থাকে চায়ের দোকান, পানের দোকান আর যারা কারো সাতেও থাকে না পাঁচেও থাকে না তাদের প্রমুখাৎ প্রচারটা বেশ পরিপাট্য লাভ করে। তাই হয়েছে এক্ষেত্রেও।

প্রতিবেশীদেরও কর্তব্যবোধটা মাথাচাড়া দেয়। এ দুঃসময়ে শুভঙ্করবাবুর পাশে দাঁড়াতে হয়। সহানুভূতির আদর্শ সামনে রেখে মানিয়ে নেওয়ার পরামর্শ মুখে নিয়ে এগিয়ে এলেন উপেন চাটুজ্যে।

সরমা দেবী মোড়াটা এগিয়ে দিলেন। বললেন তিনি। বেশ জুতসই মেজাজে শুরু করলেন—মন খারাপ কোরো না ভায়া। দিন কাল ভাল নয়। ছেলেপিলেদের চটিয়ে লাভ নেই। মাথার ওপর বিয়ের যুগ্যি মেয়ে। যেমন তেমন পাত্রে দিতে গেলেও অনেক টাকা চাই। ছেলেদের রোজগারই ভরসা। নিজের বয়েস হয়েছে। আর রোজগারই বা কি? কথাটা শুনতে খারাপ লাগতে পারে—মধু বক্সী বেয়াই হোল। জাতজন্ম? ও-সব কথা বাদ দাও তো। আজকের দিনে এসব মেনে নেওয়াই ভাল, দায়-দফায় দশ-বিশ হাজারে আটকাবে না। মধুবাবু ঠিক সামলে নেবেন। আর মেয়েটার পিতৃ-পরিচয়? ও মধু হোক আর যদুই হোক, অত ঘাঁটাঘাঁটির দরকার কি? মেয়েটার নিজের নামে কত জমি, তার ওপর

নগদও নিশ্চয়ই খুব কম নেই। সবই তো এখন নীলকান্তর। তবে মেয়েটাকে হাতে রাখতে হবে, চটানো যাবে না। তাই বলছি অশান্তি কোরো না, বুঝলে?

সরমা দেবীকেও শুভঙ্করবাবুকে বুঝিয়ে বলবার জন্যে পরামর্শ দিলেন উপেনবাবু। বলতে বলতে চলে গেলেন—ভালো হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে। আজকাল তো আর ঠেকো হবার ভয় নেই। ধোপা-নাপিত বন্ধের ব্যাপার নেই। ....

উপেনবাবুর পরামর্শ খারাপ নয়। তবে শুভঙ্করের এই সৌভাগ্যে তাঁর একটা ঈর্ষ্যাকাতরতা লক্ষ্য করা গেছে তাঁর বাক্‌ভঙ্গিমায়। এ-রকম একটা সুযোগ তিনি যদি পেতেন! তাই এই হিংসাপরায়ণতার জ্বালা জুড়োতে এরা নিয়োগী পরিবারের প্রতি কালি ছেটাতে অন্য মজলিশে গিয়ে বিষয়টাকে কেন্দ্র করে টিটকিরি-টিপ্পনীর ফোয়ারা ছোটাবে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বান ডাকিয়ে ছাড়বে। এদের চরিত্র শুভঙ্করবাবুর অজানা নয়।

তাই তাঁর মুখে কোন কথা নেই। শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস।

সুকন্যা আজ একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরেছে। সব শুনেছে সে তার কর্মস্থলেই। সহকর্মীদের ভব্যতায়, সহমর্মিতায় তার মনোবেদনার উপশম না হয়ে বরং তা দ্বিগুণিত হয়েছিল একথা ঠিক, তবে তা থেকে স্বস্তি এবং সামলে নেওয়ার শক্তি সে একটা পেয়েছিল এ কথাটাও মিথ্যে নয়।

বাবা-মায়ের মুখ দেখে সুকন্যার বুঝতে বাকি থাকে না সারা সকাল ধরে বেশ একটা উল্টো-পাল্টা ঝড় বয়ে গেছে তাদের গৃহকোণে। কতলোক কতভাবে কতকথা বলে গেছে কে জানে?

সুকন্যা আবহাওয়াটাকে হালকা করে নিল বেশ কিছুটা। মাকে বললো—কী হলো মা? এতখানি বেলা হলো, উনুনে আগুন পড়েনি এখনও? ব্যাপারটা কি? কি এমন হলো যে, তোমাদের মাথায় বাজ বিঁধেছে বলে মনে হচ্ছে। কার কাছে কি শুনেছ তোমরা?

—তোর মামা এসেছিল। সরমা দেবী বললেন।

—তাহলে তো সঠিক সংবাদই পেয়ে গেছ। নীলু তার পছন্দমত মেয়েকে বিয়ে করেছে। এতে এত মাথা খারাপের কি আছে? ভাল বুঝেছে করেছে। বেশ একটু ঝাঁঝিয়েই বলে সুকন্যা। শুভঙ্করবাবু সুকন্যার কাছে এসে বলেন- ভাল মন্দ বোঝার বয়স কি ওর হয়েছে মা? বয়সটা কত?

—তুমি থামো তো বাবা। আঠারো বছরে সাবালকত্বের তকমা দিচ্ছে সরকার আর তুমি বাইশ বছরের ছেলেকে বলছে ছেলেমানুষ। ছেলেকে গিয়ে বলো না সে-কথা'। সে বলবে, 'ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে আমি মনে করি।' কাজেই দয়া করে মিথ্যে ভেবো না বাবা, তুমি যাও চান করে এসো। ....পূজো-পাঠ সেরে নাও। মা, যাও ঘরদোরগুলো ঝাঁট-পাট দিয়ে একটু ছিরি ফেরাও। আমি রান্না করছি আজ। বিকেলেও কাজে যাবো না। ঘরেই থাকবো। ঘরের কাজকর্ম সব আমিই করবো আজ।

সত্যিই গৃহকোণে প্রাণ ফিরে এলো যেন।

★ ★ ★ ★ ★ ★

দিন নয়, মাস নয়, বছর পার হয়ে গেছে। নীলকান্ত ফেরেনি।

সুকন্যার বিয়ে। পাত্রটি ভালই পাওয়া গেছে। মুখুজ্যে বামুন। শ্বশুর বাড়িও বেশি দূরে হচ্ছে না। ট্রেনে আধ ঘণ্টা। চাকরির অসুবিধে হবে না তার। ছেলের কাজও একই লাইনে—দর্জির দোকান। বি. এ. পাশ করে দর্জির কাজ শিখে গাঁয়ে দোকান করেছে। অবস্থা ভাল নয়। পয়সার অভাবে দোকানটা ঠিকমতো করে নিয়ে ব্যবসা করতে পারছে না। একটা সুযোগ খুঁজছিল সে। ভাবছিল বিয়ের যৌতুক হিসেবে কিছু টাকা পেলে মন্দ হতো না।

কথাটা কেমন করে মধু বক্সীর কানে আসে। তিনি সুকন্যার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে পাত্রের পিতার নিকট হাজির হন। অবশ্য নেপথ্যে অতিশয়

সংগোপনে তাঁর অভিপ্রায়টা সিদ্ধ করেন। পাত্রের পিতা মধুবাবুর কথামতো কেন, প্রায় নির্দেশ মতোই পুত্রবধূরূপে সুকন্যাকে বরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন বিনা যৌতুকে। সুলক্ষণা মেয়ে, তাঁর ছেলের সঙ্গে মানাবে ভালো, তাই। ছেলেরও পছন্দ। শুভঙ্করবাবু হাতে স্বর্গ পেয়েছেন। নেহাতই ঈশ্বরের করুণা। মধু বক্সীর মতো সুদখোর লোকটা যে শুভঙ্করবাবুর ঈশ্বরের প্রতিনিধি একথা কে আর জানতো।

আত্মীয়-স্বজন-পরিজন পরিবৃত বিবাহ অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নেই সমাধা হয়ে গেল। অভাব একটাই যা সারা সংসারটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ছুঁচ-বেঁধা করছিল তা হলো নীলকান্তর উপস্থিতি। আসেনি সে। মাঝে মাঝে চিঠি দেয় মাকে। বেশি কিছু লেখে না। বার বার শুধু ক্ষমা চাওয়া। কোন চিঠিতেই ঠিকানা দেয় না। তাই তাকে চিঠির উত্তর দেওয়া যায়নি। সোমনাথ ঠিকানা পেতে চেষ্টা করেছে। মহুয়ার মায়ের কাছে গিয়েছে। দেখা হয়নি। তিনি এখানে বড় একটা থাকেন না। মধু বক্সী বলেছেন তিনি ওদের কোন সংবাদ রাখেন না।

শুভঙ্করবাবু কন্যাদায়মুক্ত হলেন। বরকনে বিদায় হলো। শান্তাকে এগিয়ে দিয়ে এলো সোমনাথ স্টেশন পর্যন্ত।

মধু বক্সী আজকাল তার বাইর বাড়িতে মোটেই যান না। ভেতর মহলেই কিছু কিছু ধর্মপুস্তক পাঠ করে দিন কাটান, সংকীর্তনও করান বিশেষ বিশেষ তিথিতে। খাওয়া-দাওয়া স্বপাকেই চলছে।

উঠোনে মাদুর পেতে বসে বুকভরা পরিতৃপ্তি নিয়ে বক্সী মশায় আরামের হাই তুলে একটা স্বর্গীয় আমেজ উপলব্ধি করলেন। একটা ভাল কাজ অন্তত করার সুযোগ ঈশ্বর তাঁকে দিয়েছেন। টাকার অভাব তাঁর নেই। কিন্তু কার ভোগে লাগবে এ টাকা? এতবড় একটা মহৎ কাজ করতে পেরে সদাই তাঁর আত্মতৃপ্তি। তাঁর পালিতা কন্যা, যাকে জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিপালন করেছেন তিনি নিজের মেয়ের থেকেও অনেক বেশি স্নেহ-যত্ন দিয়ে, তার মায়ের সহযোগিতায় একটা নিষ্পাপ

নিরীহ লোক ঐ শুভঙ্করের বুকে ছোরা বসিয়েছে। ছেলেটাকে ফুঁসলে নিয়ে গেছে। এ পাপ তার মেয়ের পাপ। 'সে মেয়ে তো তাঁর নিজের মেয়ে নয়' এ রকম একটা যুক্তি খাড়া করে তিনি এড়িয়ে যেতে পারেননি। বিবেক দিয়েছে তাঁকে সঠিক উত্তর। তাঁর নিজের পরিবারভুক্ত ঐ মা-মেয়ে। এ অন্যায় তাঁর পরিবারের, পরোক্ষে তাঁরই মানবতার আদালতে তাঁকেই এর জরিমানা দিতে হবে। তাই দিয়েছেন। ভারি কৌশল করে দিয়েছেন। গোপনে পাত্রের পিতাকে পঁচিশ হাজার টাকা গুনে দিয়েছেন সুকন্যার বিয়ের যৌতুক হিসাবে। আর কেউ না জানুক, বাহবা কেউ না দিক, দয়াময়ের আশীর্বাদ থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন না। দুর্গতি খণ্ডন হবে।

শান্তা চাকরি করছে। ইমিডিয়েট বস সৌভিক মিটার। খানায় পিনায় অ্যারিস্ট্রোক্র্যাট। আদব-কায়দায় পুরোপুরি সাহেব না হলেও ফিরিঙ্গিয়ানা প্রকট হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে। বারে যায় নিয়মিত। ফূর্তি করে এবং তুলে ধরে সে বিবরণ শান্তার কাছে। শান্তাকেও ঐ সব জায়গায় ইনভাইট করতে তার বাধে না। বর্তমানে এরাই নাকি সমাজে উঁচু তলার মানুষ। এরকম একটা লোকের হাতেই তুলে দিতে চাইছেন শান্তাকে তার বাবা।

শান্তা বাবার মুখের উপর কথা বলে না। মাকে জানিয়েছে তার কথা —সোমনাথকেই সে বিয়ে করবে। বাবা কিন্তু তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তে অনড়। তাঁর ফ্যামিলি স্ট্যাটাশ আছে। একটা লোয়ার লেবেলের ফ্যামিলিতে তাঁর আত্মীয়তা একেবারেই অসম্ভব এ কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

ইদানীং পোশাকী আধুনিকতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে শান্তা। প্যান্ট-বিলায়েতী কোর্তা বা শালোয়ার-কামিজ পরে না। চুল বব করে না। হাই হিল জুতো পরে না। দোতলার ছাদে চিলে কোঠায় ঠাকুর ঘর।

সেখানে নিরিবিলিতে অনেকটা সময় কাটায়। রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহে মালা পরায়। পুজো করে। মায়ের চওড়া লালপাড় গরদটা পরে মোড়ের কালী বাড়িতে যায় পুজো দিতে। বাবা টিপ্পনী কাটতে ছাড়েন না। মার উদ্দেশে বলেন—এগুলো কি খেস্টানীর বিরুদ্ধে জেহাদ?

মায়ের তো আজকাল বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাটে। খুবই অসুস্থ। হার্টের রোগ। হোটেল থেকে খাবার আসে। আজকাল অবশ্য শান্তাও রান্না-বাড়ায় নিজেকে রপ্ত করে নিয়েছে। ডাল, চচ্চড়ি, ঝিঙে-পোস্ত, কড়াইয়ের ডালের মতো বনেদী গেরস্থালী খাবার রান্না করে বাবা-মাকে খাওয়ায়, নিজে খায় তারিফ করে। বাবাকে কখনও কখনও বলতে হয়েছে—'বাঃ চমৎকার!'

শান্তা পুজোর ঘরে ঢুকলে বেশ সময় নেয় এখন। নিজে হাতে মালা গাঁথে। ঠাকুরকে সাজায়। প্রার্থনা করে জীবনকে তার পূর্ণতায় ভরিয়ে দিতে।

একদিন শান্তার বাবা পা টিপে টিপে ঢুকলেন ঠাকুর ঘরে। ধূপ-ধূনোর গন্ধে ভরা ছোট্ট ঘরটিতে মালাচন্দনে চর্চিত রাধামাধবের বিগ্রহ—শান্তার ভক্তিকাতর পরশে বুঝি অধিকতর ভাস্বর বলে মনে হলো তাঁর। খেস্টানীর মেকি আবরণ থাকলেও মনে প্রাণে বাঙালী হিন্দু ব্রাহ্মণ। মাথাটা নুয়ে এলো তাঁর।

দেওয়ালে চোখ পড়তেই একটু চমকালেন তিনি। ওখানে একটি বাঙালি যুবকের ফটো টাঙানো। মালা নেই গলায়। জিজ্ঞাসা করলেন শান্তাকে—কার ফটো রে মা ওটা?

শান্তা কিছুটা অপ্রতিভ হলেও কণ্ঠে দৃঢ়তা রেখেই বললো—সোমনাথের ছবি। আমি ওকে—কথাটা শেষ করতে পারলো না সে।

বাবার বুঝতে বাকি থাকলো না। অবাক হলেন না। তবে একটা সমস্যা রেখায়িত হয়ে উঠলো প্রশস্ত ললাটে তাঁর।

ঠাকুর ঘরের সৌম্য বজায় রেখে নিষ্ক্রান্ত হলেন তিনি।

নাঃ, মেয়ের মানসিকতার উপর আর কোন বিরূপতার আঁচড় কাটেননি তার বাবা। পতি নির্বাচনে তার সিদ্ধান্তেই সায় দিয়েছেন তিনি। বাবা সরাসরি শান্তাকে কিছু বলেননি। মায়ের কাছ থেকে সবই জেনেছে সে।

চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। ভাল লাগেনি। বাবাও রেগে যায়নি, বরং খুশি।

এখন থেকে সোমনাথ আর শান্তা নিজেদের মধ্যে বেশ একটু ব্যবধান রেখে চলেছে, আর তাতে সম্পর্কটা আরও যেন ঘন-নিবিড় স্বপ্নময় হয়ে উঠছে ক্রমে।

ওদিকে নীলকান্তর স্বল্প মাইনের চাকরি। নব পরিণীতা আধুনিকা স্ত্রী। শাশুড়ী প্রায়ই এসে থাকছেন এখানে। দুখানা ঘরের একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে হয়েছে। আসাবাবপত্র কেনা হয়ে উঠেছে না বিশেষ। অস্বচ্ছলতার মলিনতা ঢাকতে পারছে না কিছুতেই। মহুয়া অবশ্য গাঁটের পয়সায় ফুল কিনে এনে ফুলদানি সাজায়। কফি, চানাচুর, কেক, পকৌড়া কিনে আনে। প্রতিবেশী দু'চারটে দম্পতীকে গায়ে-পড়া ভালবাসা দিয়ে ডেকে এনে কফির আসর বসায়। হাল-ফেসানের সামাজিকতা তার বড় পছন্দ। পোশাকটাও অত্যাধুনিকতার নগ্নতা-লাঞ্ছিত। আঁটো সাঁটো একটা চোস্তা চুড়িদার আর ঊর্ধ্বাঙ্গে লেপ্টে থাকা একটা কোর্তা। নীলকান্ত তার স্বামী। তাকেও চোখ ফিরিয়ে নিতে হয় অনেক সময়। অবশ্য সিঁথিতে লম্বা টানা সিঁদুরের রোখা আর কাপালে একটা টিপ বেশ পরিপাটি করেই আঁকা থাকে। বিবাহিতার মর্যাদা, তাও যেন ঔদ্ধত্য-বিড়ম্বিত। কুরুচিকর পোশাক-আশাক সাজ-গোজ সবই যেন নীলকান্তর চক্ষুপীড়ার কারণ হয়ে পড়ে। মহুয়ার মায়ের গা জ্বলে যায় এসব দেখে। এরকমটা হবে ভাবেননি। অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছেন সারাক্ষণ। এ কী করলেন তিনি? সৎ

বংশজাত ব্রাহ্মণ নীলকান্ত। লেখাপড়াতেও ভাল ছিল। ঈশ্বরের দেওয়া প্রতিভা যা ছিল, যে মেধা ছিল, তার বিকাশে বিঘ্ন ঘটিয়েছেন তিনি, তাঁর মেয়ে। সারস্বত সাধনায় একাগ্রতা, তার মনোযোগ, তার উদ্যম সব যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। দেহে মনে বিষক্রিয়া। সবই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। মহুয়ার সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় কোন বাধা দেননি বরং মদত দিয়েছেন কিছুটা। হ্যাঁ, অন্যায় করেছেন তিনি।

কিন্তু উপায়ই বা কি ছিল? যে মেয়ের পিতৃপরিচয় নিয়ে এত কটাক্ষ, বিদ্রূপ চারিদিকে, তার বিয়ে সম্বন্ধ করে দেওয়াই বা যেত কি করে! তাই সুযোগটা হাতছাড়া করেননি। কিন্তু এই যে বিবেকের দংশন, তার থেকে রেহাই কোথায়! সকলে ছেলেটার দোষ দিচ্ছে বটে, কিন্তু তিনি তো জানেন, যে মোহিনী মায়ার ঘূর্ণীর মধ্যে তাকে পাক খাওয়ানো হয়েছিল তাতে কোন পুরুষ মানুষ টাল সমালে হাঁটতে পারে না কখনও। তিনি চোখ বুজে থেকেছেন। সায় দিয়েছেন। ছেলেটার সর্বনাশের কারণ হয়েছেন, তার বাবা-মায়ের অন্তরে অশান্তির আগুন জ্বেলে দিয়েছেন।

টাটানগর থেকে মহুয়ার মা একাই এসেছেন মধু বক্সীর দেওয়া বাইর বাড়িতে। মধুবাবু এখন আর আসেন না এখানে। মহুয়ার মায়ের মনোবেদনা কম নয়। মধুবাবুর সঙ্গে যে তাঁর ভালবাসা ছিল সে কথা মিথ্যা নয়। তবে তা ছিল স্বর্গীয়—নিষ্কলুষ, নিষ্পাপ, কামগন্ধহীন। মধুবাবুর ভালবাসার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল প্রগাঢ়। তাঁর মতো হিতাকাঙ্ক্ষী আর কে আছে তার? কিন্তু তাঁর অমতেই মেয়ের বিয়েটা দিয়ে ফেললেন তিনি তাড়াহুড়ো করে। 'যা হয় হবে' এই ভাব নিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

ওদিকে মহুয়ার অ্যারিস্ট্রোক্র্যাসির উগ্রতায় জেরবার হয়ে যাচ্ছে নীলকান্ত। অনেক সময় হাস্যাস্পদ অবস্থারও সৃষ্টি হয়। ব্রেড ছাড়া রুটি বলতে পারে না সে, বাটার ছাড়া মাখন না, বিস্কিট ছাড়া বিস্কুট না; ব্রেকফাস্ট, ডিনার, লাঞ্চ এসব তো বলছেই, চিকেন কারি রাইস, মাটন

কারি রাইস, মাটন কারি ব্রেড ইত্যাদি টেবিলে সার্ভ করে যাচ্ছে বেয়ারা। নীলকান্তের ভয় হয় কবে বিয়ার-হুইস্কির অ্যারিস্ট্রোক্র্যাসিতে না পড়ে যায়।

না, অতটা এগুতে পারেনি মহুয়া। তবে পোশাক-আশাক, আহার-বিহার, আদব-কায়দার উগ্রতা বিষক্রিয়ায় বিকারগ্রস্ত করে তুলছে না তা নয়। বাঙালী মহল্লায় বাস। কেউই যেন সামিল হতে চাইছে না তার কোথায় যেন তার পরাজয়। ব্যর্থতা। সদ্য প্রস্ফুটিত যৌবনের একটা মাদকতা আছে। সেটাকে প্রশমিত করে চলতে হয় তবেই তার মধ্যে মাধুর্যের আস্বাদন। মহুয়ার মধ্যে সে ধৈর্য ছিল না। নীলকান্ত অনেক সময় তা নিয়ে বিব্রত বোধ করেছে।

আজ একটা অদ্ভুত খেয়াল মাথায় চেপেছে মহুয়ার। নতুন করে ফুলশয্যা রচনা করে। দামী শাড়ী বের করে নীলকান্ত যেমন বৌ-বৌ-সাজ পছন্দ করে সেইভাবে সাজে। বাঙালী গৃহবধূর মর্যাদায় বিভূষিত করতে চায় নিজেকে। তুলে ধরতে চায় নীলকান্তের সামনে যেমনটি সে পছন্দ করে তেমনটি করে।

নীলকান্ত অফিস থেকে ফিরে এসব দেখেশুনে অবাক হয়ে- বটে, তবে ভাল লাগেনি বলা যায় না। আদর করে কাছে বসিয়েছে, বলেছে এবার তার মায়ের হাতে তুলে দেবে তাকে। মহুয়া তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে বলেছে—ঠিক তো? আমার মায়ের কাছে শুনেছি আমার শ্বশুরবাড়িতে সবাই বলে তুমি আমাকে বিয়ে করনি, আমি করেছি তোমাকে। নীলকান্ত বলেছে—তাতে দোষের কি? যুগ তো পাল্টাচ্ছে। রীতি-পদ্ধতিও বদলাবে।

মহুয়ার সারা মুখে হাসি ছাড়িয়ে পড়েছে। বাঙালী খানা মাছের ঝোল ভাতই খেয়েছে আজ দুজনে মাটিতে আসন পেতে বসে। ফুলে ভরা বিছানায় শুয়েছে নীলকান্ত। মহুয়া পর পর অনেকগুলো রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছে। কখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে। নীলকান্ত আর জাগায়নি

তাকে।

রাত্রি শেষ। ভোরের আলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। একটা হ্যাঁচকা টানে নিদ্রাভঙ্গ হলো নীলকান্তর। এ কি কাণ্ড! তার হাত দুটো ধরে টেনে নামাচ্ছে মহুয়া খাট থেকে। মাথাটা তার ঝুলে পড়েছে। কোন রকমে সামলে সে তার কবল থেকে মুক্ত করল নিজেকে। জানালার পাল্লাগুলো বন্ধ করে দিলো। ঘরের ভেতর আলো জ্বালালো। খাটের ওপর এসে বসেছে সবে, ঝাঁপিয়ে পড়ল মহুয়া তার ওপর। কিল, চড়, ঘুষি এমনকি নখর দংশনও বাদ গেল না। সঙ্গে সঙ্গে তার পৌরুষকে আক্রমণ করে অকথ্য গালাগাল বর্ষণ করতে করতে মেজেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। নীলকান্ত তার অঙ্গস্খলিত বেশবাস গোছগাছ করে দিয়ে পাঁজাকোলা করে তুলে খাটে শুইয়ে দিল। প্রতিবেশী দু-এক জনকে ঘুম থেকে তুলে ডেকে নিয়ে এল। বললো সব ঘটনাটা। একজন দৌড়ে গেল স্থানীয় এক ডাক্তারের কাছে। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার এলেন। বেশ কয়েকজন লোকও এসে গেছে তখন ঘরের মধ্যে। ডাক্তারবাবুকে কাল রাত্রি থেকে এখন পর্যন্ত মহুয়ার মতিগতির পূর্ণ বিবরণ দিল নীলকান্ত।

মহুয়ার জ্ঞান ফিরলো। চীৎকার করে বললো—সবাই বেরিয়ে যাও ঘর থেকে। কেবল নীলু থাকবে। আমি নাচব, ওর সামনে আমি একটা নাচ নাচব। বলেই পুনরায় দাঁতি পড়ে গেল।

ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করলেন রোগীকে। দাঁতি ছাড়িয়ে দিতে অল্প একটু সময়ের জন্য জ্ঞান এল। তারপর ঘুমিয়ে পড়লো। ডাক্তারবাবু ইনজেকসন দিলেন একটা, বললেন—ও এখন ঘুমিয়ে থাকবে।

'রোগটা কি' জিজ্ঞাসা করলো নীলকান্ত। রোগটা হরমোন ঘটিত। হিস্টিরিয়া বলে মনে হচ্ছে। সেরে যাবে। তবে এখন ওকে রাঁচি পাঠিয়ে দিন। ওখানে আমার জানাশোনা ডাক্তার আছে, লিখে দিচ্ছি।

সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে নীলকান্তের অফিসের অনেকেই। রাঁচিতেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে।

রোগীকে। নীলকান্ত রাঁচি থেকে বরাবর গিয়ে মহুয়ার মায়ের কাছে খবরটা দিল।

সানাই বাজছে শুভঙ্করবাবুর বাড়িতে। সোমনাথের বিয়ে হয়েছে শান্তার সঙ্গে পোদড়াতে। প্রায় একশ'র মতো বরযাত্রী গিয়েছিল। রীতিমত হিন্দু মতে আত্মীয়-স্বজন সমভিব্যাহারে নাপিত-বামুন নিয়ে বাঙালী ঘরের ঘরোয়া বিয়ে। আজ বৌভাত। বেশ ধুমধামেরই অনুষ্ঠান, তবে বাহুল্য-বর্জিত। প্যাণ্ডেলটা বেশ বড় করেই করা হয়েছে। রাত্রের কাজ। আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাই ডায়নামো বসানো হচ্ছে। নানান কাজে লোকজন এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। নরক গুলজার।

বেলা দ্বিপ্রহর। মধু বক্সী অবতীর্ণ হলেন শুভঙ্করবাবুর সেই আদ্যিকালের মাটির বাড়ির আঙিনায়। পিছন পিছন নীলু ও তার শাশুড়ী মহুয়ার মা। বাড়ি শুদ্ধ লোকের চোখ কপালে। ব্যাপার কি!

শুভঙ্করবাবু হতভম্ব। সরমা দেবীর কিন্তু তর সইলো না। ছুটে এসে তাঁর নীলুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন মা—বাবার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো নীলকান্ত। সোমনাথ এগিয়ে এসে নীলুর দিকে তাকিয়ে আবক্ বিস্ময়ে বলে—এ কি রে! মুখময় এত আঁচড়ের দাগ কিসের? নীলুর সংক্ষিপ্ত উত্তর—পরে বলছি।

মহুয়ার মাকে কেউ চেনে না এ বাড়িতে। সোমনাথ চেনে। অদূরে দাঁড়ানো শান্তাকে ডেকে বললো তাঁকে ভেতরে নিয়ে যেতে। নীরবে সে নির্দেশ শান্তা পালন করলো। সসম্ভ্রমে নিয়ে গেল ভেতরে।

এবার একান্তে শুভঙ্করবাবু ও সোমনাথকে ডেকে মধুবাবু নীলু-মহুয়া সংক্রান্ত কাহিনীটা বিবৃত করলেন। সবিস্তারে—অসংকোচে।

মহুয়ার মা ততক্ষণে শান্তার সঙ্গে আলাপ করে বেরিয়ে এসেছিলেন বাইরে। শুভঙ্করবাবুর অনুরোধে মিষ্টি দিয়ে জল খেলেন মধুবাবু। নইলে গেরস্থর অমঙ্গল হবে যে।

মহুয়ার মা শুধু কিছু খেলেন না। খেতে পারলেন না। চোখের জল

মুছে সরমা দেবীকে বললেন—আপনার হারানো ছেলেকে ফিরে দিয়ে গেলুম, আমার মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনতে পারি কি না দেখি।

মধু বক্সী সানুনয়ে জোড়হাতে মাপ চাওয়ার ভঙ্গীতে শুভঙ্করবাবুকে বললেন—চলি এখন ভাই রাঁচির পথে। ফিরে এসে তোমার বেটা-বৌদের আশীর্বাদ করে যাবো।

নীলকান্ত এখন কী করবে? বাবা-মা, দাদা-বৌদি, বোন ভগ্নীপতি সবার কাছে স্বাভাবিক হতে পারবে কি সে? তার প্রতি সকলের ক্ষ্যামা ঘেন্না তার সহ্য হবে তো? মহুয়া আরোগ্য লাভ করে ফিরে আসবে হয়তো। এ বাড়ির বৌ হয়ে ঘর করতে পারবে কি? নাকি তাঁলি-তাপ্পি দিয়ে চলতে গিয়ে হোঁচট খাবে কেবল?

[*নিবারণবাবু কাগজটা পাট করে মুড়ে নিয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলেন। মানসীকে কাগজটা রাখতে দিয়ে অনাদিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে চললেন বাজারের দিকে। তাঁকে বোঝাতে লাগলেন লেখাটার গুরুত্ব। আমাদের দেশে তরলমতি উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশায় প্রায়ই কুফল ফলছে। কুমার-কুমারীর প্রথম পরশের চাঞ্চল্যের প্রতিক্রিয়ায় উভয়েরই মেধাস্ফুরণে বিঘ্ন ঘটছে। উচ্ছৃঙ্খলতা ডেকে আনছে, আঘাতে সংঘাতে সংসারের ছন্দ-মাধুর্য বিনষ্ট হচ্ছে। অপর পক্ষে নিজেদের একটু সামলে নিয়ে পারিবারিক মর্যাদাকে উপেক্ষা না করে একটু শক্ত হয়ে হাঁটলে আজকের সমাজেও সমাজের মধুর ছন্দটা বজায় রাখা যায়, সেদিকটাও দেখিয়েছেন বিব্রতবাবু।*

ওদিকে মানসীও বিব্রতবাবুর লেখাগুলো মনোযোগ দিয়েই পড়ে। এ লেখায় মধুবক্সী আর মহুয়ার মায়ের ঘটনাটাই তার কাছে বড় হয়ে

উঠেছে। তাদের ঐ নিষ্কাম প্রেমের আস্বাদনের সৌভাগ্য যে তারও হয়েছে। মিথ্যা সন্দেহে সেও স্বামীপরিত্যক্তা। সন্দেহের কারণ বিনা দোষে দোষী সেই সে বঁধুয়া। তার হীরা নামটা বদলে মানসী রেখেছে সে। দোকানটাও তারই করে দেওয়া। যায় সে এ-পথ দিয়ে কখনো কখনো। মানসী শুধু দেখে তারে চেয়ে চেয়ে : এ কোন্ প্রেমের তরে ঝরে তার আঁখিলোর! সে কি পরকীয়া!]

—○—